এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
কলিকাতা-১২

বুদ্ধদেব বসু

সম্পাদিত

STATE CENTRAL LIBRARY W.B
VIP Road. Calcutta

বাংলা কবিতা

আধুনিক বাংলা কবিতা

ভূমিকা

বাংলা কবিতা রূপে-রসে উজ্জ্বল ও বিচিত্র, পরিমাণেও প্রচুর, অথচ সেই তুলনায় সংকলন-গ্রন্থ যথেষ্ট নেই। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে যে-ক'টি বেরিয়েছে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা অথবা বৈবাহিক উপহার লক্ষ্য করার জন্য তারা সাহিত্যিকের পক্ষে তৃপ্তিকর হ'তে পারেনি। বাংলা বইয়ের কাটতির এই সুপারিশ দুটি এড়িয়ে গিয়ে শুধু আনন্দের জন্যই কাব্যচয়নে প্রবৃত্ত হবার প্রয়োজন আছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সেই ধরনের প্রথম প্রচেষ্টা, বলা যায়।

এই বইয়ের পরিকল্পনা আমার মনে জেগে ওঠে আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলোচনার ফলে, এবং সহৃদয় প্রকাশকের সহযোগিতায়, কল্পনাটিকে বাস্তবে পরিণত করা অসম্ভব হয়নি। সেবারে সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন দু-জন রসজ্ঞ সমালোচক; তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মেলবার মতো জায়গাও প্রশস্ত ছিলো ব'লে বইখানার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। এবারে সম্পাদন করতে হ'লো আমাকে। কোনো পাঠক দুটি সংস্করণের তুলনা ক'রে দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন, পূর্ববর্তী সম্পাদকদের সঙ্গে কোথায় আমার রুচির প্রভেদ।

কিন্তু প্রভেদটা যে একান্তভাবে রুচিবৈষম্যের জন্যই ঘটেছে, তাও নয়। মধ্যবর্তী বছরগুলিতে পুরোনো কবিদের অনেক নতুন লেখা বেরিয়েছে, অনেক নতুন কবি দেখা দিয়েছেন। সেই কারণে পরিবর্তনের অনিবার্য প্রয়োজন ছিলো। তাছাড়া, পূর্ববর্তী সম্পাদকেরা আধুনিকতার বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ স্থির ক'রে নিয়েছিলেন; সামাজিক বিষয়, বিতর্ক, ব্যঙ্গ, মননধর্মিতা, নূতনতর ভবিষ্যতের দিকে উন্মুখতা, এই রকম কয়েকটি চিহ্নের সাহায্যে এঁরা যাচাই এবং বাছাই করেছিলেন। বাংলা কবিতায় এই লক্ষণগুলো সদ্য দেখা দিয়েছে সেই সময়ে, তখনকার মতো ঐ দিকেই বিশেষভাবে ঝোঁক পড়া অস্বাভাবিক ছিলো না। কিন্তু এর ফলে অন্য দিকে অসম্পূর্ণতা ঘ'টে গেলো, গীতধর্মিতার স্থান হ'লো সংকুচিত, অনুভূতির কবিতা, আবেগের কবিতা উপযুক্ত মর্যাদা পেলো না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য এই যে আধুনিক বাংলা কবিতা এই দুই দিকেই সক্রিয় এবং উল্লেখযোগ্য; আর আমার সৌভাগ্য এই যে উভয় ক্ষেত্রেই আমার আনন্দ অবারিত। সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতায় আমার মন যেমন সাড়া দেয়, জীবনানন্দর দৃশ্যগন্ধময় নির্জন কান্তারেও আমি তেমনি আনন্দে বিচরণ

করি, বিষ্ণু দে-র অল্প-বলায় চাতুরী আমাকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি আমি কান পেতে শুনতে চাই অমিয় চক্রবর্তীর নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ। এইজন্য আমার পক্ষে উভয় দিকের সমতা রক্ষা করা শক্ত হয়নি ; কোথাও-কোথাও কবিতার নির্বাচনে এত বেশি অদল-বদল করতে হয়েছে যে অংশত এটিকে প্রায় নতুন বই বলা যায়।

সকলের রুচি একরকম নয়, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে, তবু আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না-ক'রে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখতে। কোনো-একটা 'যুগ' বা 'আন্দোলনে'র চরিত্রলক্ষণ এক কথায় ব'লে দেয়া অসম্ভব, চারদিক থেকে আলো ফেললে তবেই তার চেহারাটি ফুটে বেরোয়। উদাহরণত, ইওরোপের উনিশ-শতকী রোমান্টিক আন্দোলনের দশটি সংজ্ঞা যদি উদ্ধৃত করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে তার অনেকগুলোই ঘোরতররকম পরস্পর-বিরোধী, কোনোটি প্রশংসায় প্রদীপ্ত, কোনোটি আক্রমণে প্রখর, অথচ প্রত্যেকটিকেই আংশিকভাবে সত্য ব'লে স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই, রোমান্টিক বেদনার তাৎপর্য বুঝতে হ'লে সবগুলোকেই একসঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আরো উল্লেখ্য এই যে যে-কবি 'হ্বের্থেরের দুঃখ' লিখে সারা ইওরোপটাকে অশ্রুপ্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তিনিই রোমান্টিকতাকে অভিহিত করেছিলেন 'রুগ্নতা' ব'লে। একজন প্রতিভাবান মানুষের মধ্যেই যখন এই রকম আত্মবিরোধ সম্ভব, তখন কোনো সমগ্র যুগের সৃষ্টির বেগে স্রোতের তলায় আবর্ত থাকবে সে তো স্বতঃসিদ্ধ কথাই। সাহিত্য জিনিসটা মানুষের চিত্তের নির্যাস, আর মনের মহিমাই এইখানে যে সে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না, অনেক বিরোধ, ব্যতিক্রম, অসংগতির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশের পথ এঁকে-বেঁকে চলতে থাকে। এইজন্য সাহিত্যকে যে-কোনো রকম ফর্মুলার মধ্যে বাঁধতে গেলে বোধের বিকৃতি এড়ানো যায় না।

বাংলা ভাষার আধুনিক কবিতার সমগ্র রূপটিকে দেখবার পক্ষে যাতে সাহায্য হয়, এই গ্রন্থ সংকলনে মনে-মনে আমি তা-ই ইচ্ছে করেছি। আশা করি সে-ইচ্ছা একেবারে ব্যর্থ হবে না। অবশ্য 'সমগ্র' বললে বড্ড বেশি বলা হ'য়ে যায় : ছোটো নৌকোয় ইচ্ছেমতো যাত্রী তুলতে পারিনি ; আমি যেমন নির্বাচন করতে গিয়ে বার-বার লোভে দ্বিধায় কম্পমান হয়েছি, তেমনি কোনো

পাঠকও নিশ্চয়ই নালিশ জানাবেন তাঁদের বিশেষ প্রিয় কোনো-কোনো কবিতা নেই ব'লে। তবু অন্তত এটুকু বলা যায় যে গত পঁচিশ বা তিরিশ বছরের বাংলা কবিতার মোটামুটি পরিচয় থাকলো এখানে, অন্তত আগ্রহ জাগাবার পক্ষে, আনন্দ পাবার পক্ষে, ফিরে-ফিরে পড়ার এবং ভাবার পক্ষে যথেষ্ট। নিশ্চয়ই এই বইয়ের ভাগ্যে এমন পাঠকও জুটবে, যিনি এটুকু পরিচয়েই তৃপ্ত হবেন, আর যদি কারো মনে আরো নিবিড় ও বিস্তারিতভাবে জানবার জন্ম আগ্রহ জেগে ওঠে, সে তো খুব সুখের কথাই। কিন্তু কিছুটা অসতর্কভাবে পাতা উল্টিয়ে গেলেও আশা করি এটুকু চোখে পড়বে যে আমাদের সাম্প্রতিক কবিরা কত বিচিত্রভাবে সৃষ্টিশীল। এই বৈচিত্র্যের উপর আমি একটু জোর দিতে চাই, কেননা এর মূল্য শুধু অলংকার হিসেবে বা স্বাদ-বদলের তাগিদে নয়, প্রাণের ঐশ্বর্যের নামই বৈচিত্র্য। সকলেই জানেন, সমকালীন এবং ঐতিহাসিক অর্থে একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত কবিদের মধ্যেও ব্যক্তিস্বরূপের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য দেখা যায় প্রচুর, সে-প্রভেদ কখনো বা এতই দুস্তর যে ঐতিহাসিক সাদৃশ্যটাই খুঁজে পাওয়া শক্ত হ'য়ে পড়ে। সকলেই জানেন, কিন্তু সকলেই এ-কথা মেনে নিয়ে সুখী হ'তে পারেন না; সমালোচকের চেষ্টা থাকে একই ছকের মধ্যে সকলকে ধরিয়ে দিতে, তার জন্ম কোথাও-কোথাও কোনো-কোনো কবিকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে দুমড়িয়ে নিতে—কিংবা উপেক্ষা করতেও—অনেক সময় তাঁর বিবেকে বাধে না। সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে ও-রকম কোনো শৃঙ্খল বা শৃঙ্খলা হয়তো মেনে নিতেই হয়, কিন্তু যে-ভাগ্যবান পাঠকের ও-সব বালাই নেই, যাঁকে ক্লাশ পড়াতেও হবে না, পরীক্ষা পাশ করতেও হবে না, তিনি প্রত্যেক কবির বৈশিষ্ট্যের দিকটাই স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করতে পারেন—যদি তাঁর মনে সংবেদনশীলতার অভাব না থাকে। ওয়ার্ড্স্বার্থের সঙ্গে কীটসের প্রায় কিছুই মেলে না, তার চেয়েও কম মেলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্তর সঙ্গে অমিয় চক্রবর্তী, অথচ জন্মক্ষণের সামীপ্য ছাড়া আর কোন কারণে তাঁরা একই আন্দোলনের অন্তর্ভূ'ত হলেন, তা নিয়ে চিন্তা না-ক'রে কেউ যদি উভয়ের কবিতাই আনন্দের সঙ্গে প'ড়ে উঠতে পারেন, আমি বলবো সেটুকুই সাচ্চা লাভ। আধুনিক বাংলা কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা যেন সবিস্ময়ে এই কথাটা উপলব্ধি করি যে ঐক্যের মধ্যেও বিপরীতের স্থান আছে, বিরোধের মধ্যেও সংহতির সম্ভাবনা।

ভালো তার কৃতিত্বে তাঁরও অংশ আছে, কিন্তু দোষত্রুটিগুলোর দায়িত্ব সম্পূর্ণই আমার।

যে-সব লেখক, প্রকাশক ও লেখকের স্বত্বাধিকারী কবিতার পুনর্মুদ্রণের জন্য অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

নবেম্বর, ১৯৫৩

বু. ব.

সূচীপত্র

সূচি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

১ সন্ধ্যা ও প্রভাত

এখানে নামল সন্ধ্যা। সূর্যদেব, কোন্ দেশে, কোন্ সমুদ্র-পারে, তোমার প্রভাত হল।

অন্ধকারে এখানে কেঁপে উঠছে রজনীগন্ধা, বাসরঘরের দ্বারের কাছে অবগুণ্ঠিতা নববধূর মতো; কোন্‌খানে ফুটল ভোরবেলাকার কনকচাঁপা।

জাগল কে। নিবিয়ে দিল সন্ধ্যায়-জ্বালানো দীপ, ফেলে দিল রাত্রে-গাঁথা সেঁউতিফুলের মালা।

এখানে একে একে দরজায় আগল পড়ল, সেখানে জানলা গেল খুলে। এখানে নৌকো ঘাটে বাঁধা, মাঝি ঘুমিয়ে; সেখানে পালে লেগেছে হাওয়া।

ওরা পান্থশালা থেকে বেরিয়ে পড়েছে, পূবের দিকে মুখ করে চলেছে; ওদের কপালে লেগেছে সকালের আলো, ওদের পারানির কড়ি এখনো ফুরোয় নি; ওদের জন্যে পথের ধারের জানলায় জানলায় কালো চোখের করুণ কামনা অনিমেষ চেয়ে আছে; রাস্তা ওদের সামনে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি খুলে ধরলে, বললে, "তোমাদের জন্যে সব প্রস্তুত।" ওদের হৃৎপিণ্ডের রক্তের তালে তালে জয়ভেরী বেজে উঠল।

এখানে সবাই ধূসর আলোয় দিনের শেষ খেয়া পার হল।

পান্থশালার আঙিনায় এরা কাঁথা বিছিয়েছে; কেউ বা একলা, কারো বা সঙ্গী ক্লান্ত; সামনের পথে কী আছে অন্ধকারে দেখা গেল না, পিছনের পথে কী ছিল কানে কানে বলাবলি করছে; বলতে বলতে কথা বেধে যায়, তার পরে চুপ করে থাকে; তার পরে আঙিনা থেকে উপরে চেয়ে দেখে, আকাশে উঠেছে সপ্তর্ষি।

সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে

তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পরবর্তী ওর বিভাসকে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাক।

২ একটি দিন

মনে পড়ছে সেই দুপুর বেলাটি। ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টিধারা ক্লান্ত হয়ে আসে, আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তোলে।

ঘরে অন্ধকার, কাজে মন যায় না। যন্ত্রটা হাতে নিয়ে বর্ষার গানে মল্লারের সুর লাগালেম।

পাশের ঘর থেকে একবার সে কেবল দুয়ার পর্য্যন্ত এল। আবার ফিরে গেল। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পরে ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসল। হাতে তার সেলাইয়ের কাজ ছিল, মাথা নিচু করে সেলাই করতে লাগল। তার পরে সেলাই বন্ধ ক'রে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

বৃষ্টি ধরে এল, আমার গান থামল। সে উঠে চুল বাঁধতে গেল।

এইটুকু ছাড়া আর কিছুই না। বৃষ্টিতে গানেতে অকাজে আঁধারে জড়ানো কেবল সেই একটি দুপুরবেলা।

ইতিহাসে রাজাবাদশার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী, সস্তা হয়ে ছড়াছড়ি যায়। কিন্তু একটি দুপুরবেলার ছোটো একটু কথার টুকরো দুর্লভ রত্নের মতো কালের কৌটোর মধ্যে লুকোনো রইল, দুটি লোক তার খবর জানে।

৩ পূর্ণতা

১

স্তব্ধরাতে একদিন
নিদ্রাহীন
আবেগের আন্দোলনে তুমি
বলেছিলে নতশিরে
অশ্রুনীরে
ধীরে মোর করতল চুমি—

"তুমি দূরে যাও যদি,
নিরবধি
শূন্যতার সীমাশূন্য ভারে
সমস্ত ভুবন মম
মরুসম
রুক্ষ হয়ে যাবে একেবারে।
আকাশ-বিস্তীর্ণ ক্লান্তি
সব শান্তি
চিত্ত হতে করিবে হরণ,—
নিরানন্দ নিরালোক
স্তব্ধ শোক
মরণের অধিক মরণ ॥"

২

শুনে, তোর মুখখানি
বক্ষে আনি
বলেছিনু তোরে কানে কানে,—
"তুই যদি যাস দূরে
তোরি সুরে
বেদনা-বিদ্যুৎ গানে গানে
ঝলিয়া উঠিবে নিত্য,
মোর চিত্ত
সচকিবে আলোকে-আলোকে।
বিরহ বিচিত্র খেলা
সারা বেলা
পাতিবে আমার বক্ষে চোখে।
তুমি খুঁজে পাবে প্রিয়ে,
দূরে গিয়ে
মর্ম্মের নিকটতম দ্বার,—
আমার ভুবনে তবে
পূর্ণ হবে
তোমার চরম অধিকার ॥"

৩

দুজনের সেই বাণী
কানাকানি,
শুনেছিল সপ্তর্ষির তারা।
রজনীগন্ধার বনে
ক্ষণে ক্ষণে
বহে গেল সে বাণীর ধারা।
তার পরে চুপে চুপে
মৃত্যুরূপে
মধ্যে এল বিচ্ছেদ অপার।
দেখাশুনা হলো সারা,
স্পর্শহারা
সে অনন্তে বাক্য নাহি আর
তবু শূন্য শূন্য নয়,
ব্যথাময়
অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ সে গগন।
একা-একা সে অগ্নিতে
দীপ্তগীতে
সৃষ্টি করি স্বপ্নের ভুবন ॥

৪ অচেনা

রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী ক'রে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে ?
কোন্ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রাজাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
মুখ দেখিলাম তোর।
চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, 'কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে ?'

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে-কানে মৃদু কণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে
নির্দ্দয় আলোতে।
জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্ত্তে চিনিবি আপনারে;
ছিন্ন হবে ডোর,
তোমার মুক্তিতে তবে মুক্তি হবে মোর।

হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় র'বে না;
মহা আকস্মিক
বাধাবন্ধ ছিন্ন করি দিক্,
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।

৫ প্রশ্ন

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত, পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে,' বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো'।—
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির-দ্বারে
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

৬ বিস্ময়

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হোলো ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।
ডুবে গেছে কত মহাদেশ,
নিবে গেছে কত তারা, হয়েছে নিঃশেষ
কত যুগ যুগান্তর। বিশ্বজয়ী বীর
নিজেরে বিলুপ্ত করি শুধু কাহিনীর
বাক্যপ্রান্তে আছে ছায়াপ্রায়। কত জাতি
কীর্তিস্তম্ভ রক্তপঙ্কে তুলেছিল গাঁথি
মিটাতে ধূলির মহাক্ষুধা। সে-বিরাট
ধ্বংসধারা-মাঝে আজি আমার ললাট
পেল অরুণের টিকা আরো একদিন
নিদ্রাশেষে, এই তো বিস্ময় অন্তহীন।

আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্কসভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে,
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্যলীলা। এ বনস্পতির
বল্কলে স্বাক্ষর আছে বহু শতাব্দীর,
কত রাজমুকুটেরে দেখিল খসিতে।
তারি ছায়াতলে আমি পেয়েছি বসিতে
আরো একদিন—

জানি এ দিনের মাঝে
কালের অদৃশ্য চক্র শব্দহীন বাজে।

বাঁশি

কিনু গোয়ালার গলি।
দোতলা বাড়ির
লোহার গরাদে-দেওয়া একতলা ঘর
পথের ধারেই।
লোনা ধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধসে গেছে বালি,
মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

মার্কিন থানের মার্কা একখানা ছবি
সিদ্ধিদাতা গণেশের
দরজার 'পরে আঁটা।
আমি ছাড়া ঘরে থাকে আরেকটা জীব
এক ভাড়াতেই,
সেটা টিকটিকি।
তফাত আমার সঙ্গে এই শুধু,
নেই তার অন্নের অভাব।

বেতন পঁচিশ টাকা,
সদাগরি আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি।
খেতে পাই দত্তদের বাড়ি
ছেলেকে পড়িয়ে।
শেয়ালদা ইস্‌টিশনে যাই,
সন্ধ্যেটা কাটিয়ে আসি,
আলো জ্বালাবার দায় বাঁচে।

এঞ্জিনের ধস্‌ ধস্‌,
বাঁশির আওয়াজ,
যাত্রীর ব্যস্ততা,
কুলি হাঁকাহাঁকি।
সাড়ে দশ বেজে যায়,
তার পরে ঘরে এসে নিরালা নিঃঝুম অন্ধকার।

ধলেশ্বরী নদীতীরে পিসিদের গ্রাম।
তাঁর দেওরের মেয়ে,
অভাগার সাথে তার বিবাহের ছিল ঠিকঠাক।
লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল,—
সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
মেয়েটা তো রক্ষে পেলে,
আমি তথৈবচ।
ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসাযাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জমে ওঠে পচে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,

মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা—দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।

আপিসের সাজ
গোপীকান্ত গোঁসাইয়ের মনটা যেমন,
সর্ব্বদাই রসসিক্ত থাকে।
বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁৎসেতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্চ্ছায় অসাড়।
দিনরাত মনে হয়, কোন্ আধমরা
জগতের সঙ্গে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে আছি।

গলির মোড়েই থাকে কান্তবাবু,
যত্নে পাট-করা লম্বা চুল,
বড়ো বড়ো চোখ,
সৌখিন মেজাজ।
কর্নেটবাজানো তার শখ।
মাঝে মাঝে সুর জেগে ওঠে
এ গলির বীভৎস বাতাসে
কখনো গভীর রাতে,
ভোরবেলা আধো অন্ধকারে—
কখনো বৈকালে
ঝিকিমিকি আলোয়-ছায়ায়।

হঠাৎ সন্ধ্যায়
সিন্ধু বারোয়াঁয় লাগে তান,

সমস্ত আকাশে বাজে
অনাদি কালের বিরহবেদনা।

তখনি মুহূর্তে ধরা পড়ে
এ গলিটা ঘোর মিছে
দুর্বিষহ মাতালের প্রলাপের মতো।
হঠাৎ খবর পাই মনে,
আকবর বাদশার সংগে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।
বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়াছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

এ গান যেখানে সত্য
অনন্ত গোধূলিলগ্নে
সেইখানে
বহি চলে ধলেশ্বরী,
তীরে তমালের ঘন ছায়া,
আঙিনাতে
যে আছে অপেক্ষা করে, তার
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

৮ সাধারণ মেয়ে

আমি অন্তঃপুরের মেয়ে,—
চিনবে না আমাকে।
তোমার শেষ গল্পের বইটি পড়েছি, শরৎবাবু,
'বাসি ফুলের মালা।'—
তোমার নায়িকা এলোকেশীর মরণদশা ধরেছিল
পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে।
পঁচিশ বছর বয়সের সংগে ছিল তার রেষারেষি,—

দেখলেম, তুমি মহদাশয় বটে,
জিতিয়ে দিলে তাকে।
নিজের কথা বলি।
বয়স আমার অল্প।
একজনের মন ছুঁয়েছিল
আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া।
তাই জেনে পুলক লাগত আমার দেহে,—
ভুলে গিয়েছিলেম, অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে আমি।
আমার মতো এমন আছে হাজার হাজার মেয়ে
অল্প বয়সের মন্ত্র তাদের যৌবনে।

তোমাকে দোহাই দিই,
একটি সাধারণ মেয়ের গল্প লেখো তুমি।
বড়ো দুঃখ তার।
তারও স্বভাবের গভীরে
অসাধারণ যদি কিছু তলিয়ে থাকে কোথাও,
কেমন করে প্রমাণ করবে সে,
এমন কজন মেলে যারা তা ধরতে পারে।
কাঁচাবয়সের জাদু লাগে ওদের চোখে,
মন যায় না সত্যের খোঁজে,
আমরা বিকিয়ে যাই মরীচিকার দামে।

কথাটা কেন উঠল তা বলি।
মনে করো, তার নাম নরেশ।
সে বলেছিল, কেউ তার চোখে পড়েনি আমার মতো।
এতবড়ো কথাটা বিশ্বাস করব যে সাহস হয় না,—
না করব যে এমন জোর কই।

একদিন সে গেল বিলেতে।
চিঠিপত্র পাই কখনো বা।
মনে মনে ভাবি, রাম রাম, এত মেয়েও আছে সেদেশে,
এত তাদের ঠেলাঠেলি ভিড়।

আর তারা কি সবাই অসামান্য,
এত বুদ্ধি, এত উজ্জ্বলতা।
আর, তারা সবাই কি আবিষ্কার করেছে এক নরেশ সেনকে
স্বদেশে যার পরিচয় চাপা ছিল দশের মধ্যে।

গেল মেল-এর চিঠিতে লিখেছে
লিজির সঙ্গে গিয়েছিল সমুদ্রে নাইতে।
বাঙালি কবির কবিতা ক-লাইন দিয়েছে তুলে,
সেই যেখানে উর্ব্বশী উঠছে সমুদ্র থেকে।
তার পরে বালির প'রে বসল পাশাপাশি,-
সামনে দুলছে নীল সমুদ্রের ঢেউ,
আকাশে ছড়ানো নির্ম্মল সুর্য্যালোক।
লিজি তাকে খুব আস্তে আস্তে বললে,
"এই সেদিন তুমি এসেছ, দুদিন পরে যাবে চলে,
ঝিনুকের দুটি খোলা,
মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট অশ্রুবিন্দু দিয়ে,—
দুর্ল্লভ মূল্যহীন।"
কথা বলবার কী অসামান্য ভঙ্গি।
সেই সঙ্গে নরেশ লিখেছে,
"কথাগুলি যদি বানানো হয় দোষ কী,
কিন্তু চমৎকার,—
হীরে-বসানো সোনার ফুল কি সত্য, তবুও কি সত্য নয় ?"
বুঝতেই পারছ,
একটা তুলনার সঙ্কেত ওর চিঠিতে অদৃশ্য কাঁটার মতো
আমার বুকের কাছে বিঁধিয়ে দিয়ে জানায়—
আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে।
মূল্যবানকে পুরো মূল্য চুকিয়ে দিই
এমন ধন নেই আমার হাতে।
ওগো না হয় তাই হল,
না-হয় ঋণীই রইলেম চিরজীবন।

পায়ে পড়ি তোমার, একটা গল্প লেখো তুমি, শরৎবাবু,
নিতান্তই সাধারণ মেয়ের গল্প,—
যে দুর্ভাগিনীকে দূরের থেকে পাল্লা দিতে হয়
অন্তত পাঁচ-সাতজন অসামান্যার সংগে—
অর্থাৎ সপ্তরথিনীর মার।
বুঝে নিয়েছি আমার কপাল ভেঙেছে,
হার হয়েছে আমার।
কিন্তু তুমি যার কথা লিখবে,
তাকে জিতিয়ে দিয়ো আমার হয়ে,
পড়তে পড়তে বুক যেন ওঠে ফুলে।
ফুলচন্দন পড়ুক তোমার কলমের মুখে।

তাকে নাম দিয়ো মালতী।
ঐ নামটা আমার।
ধরা পড়বার ভয় নেই;
এমন অনেক মালতী আছে বাংলাদেশে,
তারা সবাই সামান্য মেয়ে,
তারা ফরাসী জর্ম্মান জানে না,
কাঁদতে জানে।
কী করে জিতিয়ে দেবে।
উচ্চ তোমার মন, তোমার লেখনী মহীয়সী।
তুমি হয়তো ওকে নিয়ে যাবে ত্যাগের পথে,
দুঃখের চরমে, শকুন্তলার মতো।
দয়া ক'রো আমাকে।
নেমে এসো আমার সমতলে।
বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির অন্ধকারে
দেবতার কাছে যে অসম্ভব বর মাগি—
সে বর আমি পাব না,
কিন্তু পায় যেন তোমার নায়িকা।

কার্থনা কেন নরেশকে সাত বছর লণ্ডনে,
বারে বারে ফেল করুক তার পরীক্ষায়,
আদরে থাক্ আপন উপাসিকামণ্ডলীতে।
ইতিমধ্যে মালতী পাস করুক এম. এ.
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে,
গণিতে হ'ক প্রথম, তোমার কলমের এক আঁচড়ে।
কিন্তু ওইখানেই যদি থাম
তোমার সাহিত্যসম্রাট নামে পড়বে কলঙ্ক।
আমার দশা যাই হ'ক,
খাটো ক'রো না তোমার কল্পনা।
তুমি তো কৃপণ নও বিধাতার মতো।
মেয়েটাকে দাও পাঠিয়ে য়ুরোপে।
সেখানে যারা জ্ঞানী যারা বিদ্বান যারা বীর,
যারা কবি যারা শিল্পী যারা রাজা,
দল বেঁধে আসুক ওর চার দিকে।
জ্যোতির্ব্বিদের মতো আবিষ্কার করুক ওকে,
শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।
ওর মধ্যে যে বিশ্ববিজয়ী জাদু আছে
ধরা পড়ুক তার রহস্য, মূঢ়ের দেশে নয়,
যে দেশে আছে সমজদার, আছে দরদি,
আছে ইংরেজ জর্ম্মান ফরাসি।
মালতীর সম্মানের জন্য সভা ডাকা হ'ক না,—
বড়ো বড়ো নামজাদার সভা।
মনে করা যাক সেখানে বর্ষণ হচ্ছে মুষলধারে চাটুবাক্য,
মাঝখান দিয়ে সে চলেছে অবহেলায়—
ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকো।
ওর চোখ দেখে ওরা করছে কানাকানি,
সবাই বলছে, ভারতবর্ষের সজল মেঘ আর উজ্জ্বল রৌদ্র
মিলেছে ওর মোহিনী দৃষ্টিতে।
(এইখানে জনান্তিকে বলে রাখি,
সৃষ্টিকর্ত্তার প্রসাদ সত্যই আছে আমার চোখে।

বলতে হল নিজের মুখেই,
এখনো কোনো য়ুরোপীয় রসজ্ঞের
সাক্ষাৎ ঘটেনি কপালে।
নরেশ এসে দাঁড়াক সেই কোণে,
আর তার সেই অসামান্য মেয়ের দল।
আর, তার পরে ?
তার পরে আমার নটেশাকটি মুড়োল,
স্বপ্ন আমার ফুরোল।
হায় রে সামান্য মেয়ে
হায় রে বিধাতার শক্তির অপব্যয়।

৯. শিশুতীর্থ

রাত কত হল ?
উত্তর মেলে না।
কেন না অন্ধ কাল যুগযুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের চক্ষুকোটরের মতো;
স্তূপেস্তূপে মেঘ আকাশের বুক চেপে ধরেছে;
পুঞ্জ পুঞ্জ কালিমা গুহায় গর্তে সংলগ্ন
মনে হয় নিশীথ রাত্রের ছিন্ন অংগপ্রত্যংগ;
দিগন্তে একটা আগ্নেয় উগ্রতা
ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে আর নেভে;
ওকি কোনো অজানা দুষ্টগ্রহের চোখ-রাঙানি,
ওকি কোনো অনাদি ক্ষুধার লেলিহ লোল জিহ্বা।
বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,
দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদি,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপংক্তি শূন্যতায় অবসিত।

অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আবর্ত্তিত আলোড়িত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যাবারির গুহাবিদারণের রলরোল।
ও কি ঘূর্ণতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্রমন্ত্র উচ্চারণ ?
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়নিনাদ ?
এই ভীষণ কোলাহলের তলে তলে একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত-
যেন অগ্নিগিরিনিঃসৃত গদগদকলমুখর পঙ্কস্রোত;
তাতে একত্রে মিলেছে পরশ্রীকাতরের কানাকানি, কুৎসিত জনশ্রুতি,
অবজ্ঞার কর্কশহাস্য।
সেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো,
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে,
মশালের আলোয় ছায়ায় তাদের মুখে
বিভীষিকার উল্কি পরানো।
কোনো এক সময়ে অকারণ সন্দেহে কোনো-এক পাগল
তার প্রতিবেশীকে হঠাৎ মারে,
দেখতে দেখতে নির্ব্বিচার বিবাদ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে দিকে দিকে।
কোনো নারী আর্ত্তস্বরে বিলাপ করে,
বলে, হায় হায়, আমাদের দিশাহারা সন্তান উচ্ছন্ন গেল।
কোনো কামিনী যৌবনমদবিলসিত নগ্ন দেহে অট্টহাস্য করে,
বলে, কিছুতে কিছু আসে যায় না ॥

২

উর্দ্ধে গিরিচূড়ায় বসে আছে ভক্ত, তুষারশুভ্র নীরবতার মধ্যে;—
আকাশে তার নিদ্রাহীন চক্ষু খোঁজে আলোকের ইঙ্গিত।
মেঘ যখন ঘনীভূত, নিশাচর পাখি চিৎকার শব্দে যখন উড়ে যায়,
সে বলে, ভয় নেই ভাই, মানবকে মহান্ বলে জেনো।
ওরা শোনে না, বলে পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, বলে, পশুই শাশ্বত;
বলে, সাধুতা তলে তলে আত্মপ্রবঞ্চক।
যখন ওরা আঘাত পায়, বিলাপ করে বলে, ভাই তুমি কোথায় ?
উত্তরে শুনতে পায়, আমি তোমার পাশেই।

অন্ধকারে দেখতে পায় না, তর্ক করে, এ বাণী ভয়ার্তের মায়াসৃষ্টি,
আত্মসান্ত্বনার বিড়ম্বনা।
বলে, মানুষ চিরদিন কেবল সংগ্রাম করবে,
মরীচিকার অধিকার নিয়ে
হিংসাকণ্টকিত অন্তহীন মরুভূমির মধ্যে।

৩

মেঘ সরে গেল।
শুকতারা দেখা দিল পূর্ব্বদিগন্তে,
পৃথিবীর বক্ষ থেকে উঠল আরামের দীর্ঘনিশ্বাস,
পল্লবমর্ম্মর বনপথে-পথে হিল্লোলিত,
পাখি ডাক দিল শাখায়-শাখায়।
ভক্ত বললে, সময় এসেছে।
কিসের সময়?
যাত্রার।
ওরা বসে ভাবলে।
অর্থ বুঝলে না, আপন আপন মনের মতো অর্থ বানিয়ে নিলে।
ভোরের স্পর্শ নামল মাটির গভীরে,
বিশ্বসত্তার শিকড়ে শিকড়ে কেঁপে উঠল প্রাণের চাঞ্চল্য।
কে জানে কোথা হতে একটি অতি সূক্ষ্মস্বর
সবার কানে কানে বললে,
চলো সার্থকতার তীর্থে।
এই বাণী জনতার কণ্ঠে কণ্ঠে
একটি মহৎ প্রেরণায় বেগবান হয়ে উঠল।
পুরুষেরা উপরের দিকে চোখ তুললে,
জোড় হাত মাথায় ঠেকালে মেয়েরা।
শিশুরা করতালি দিয়ে হেসে উঠল।
প্রভাতের প্রথম আলো ভক্তের মাথায় সোনার রঙের চন্দন পরালে,
সবাই বলে উঠল, ভাই, আমরা তোমার বন্দনা করি।

৪

যাত্রীরা চারিদিক থেকে বেরিয়ে পড়ল—
সমুদ্র পেরিয়ে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে, পথহীন প্রান্তর উত্তীর্ণ হয়ে—
এল নীলনদীর দেশ থেকে, গঙ্গার তীর থেকে,
তিব্বতের হিমমজ্জিত অধিত্যকা থেকে;
প্রাকাররক্ষিত নগরের সিংহদ্বার দিয়ে,
লতাজালজটিল অরণ্যে পথ কেটে।
কেউ আসে পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ ঘোড়ায়, কেউ হাতিতে,
কেউ রথে চীনাংশুকের পতাকা উড়িয়ে।
নানা ধর্ম্মের পূজারি চলল ধূপ জ্বালিয়ে, মন্ত্র প'ড়ে;
রাজা চলল, অনুচরদের বর্শাফলক রৌদ্রে দীপ্যমান,
ভেরী বাজে গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে।
ভিক্ষু আসে ছিন্ন কন্থা প'রে,
আর রাজ-অমাত্যের দল স্বর্ণলাঞ্ছনখচিত উজ্জ্বল বেশে;—
জ্ঞানগরিমা ও বয়সের ভারে মন্থর অধ্যাপককে ঠেলে দিয়ে চলে
চটুলগতি বিদ্যার্থী যুবক।
মেয়েরা চ'লেছে কলহাস্যে, কত মাতা, কুমারী, কত বধূ;
থালায় তাদের শ্বেতচন্দন, ঝারিতে গন্ধসলিল।
বেশ্যাও চলেছে সেই সঙ্গে, তীক্ষ্ণ তাদের কণ্ঠস্বর,
অতি-প্রকট তাদের প্রসাধন।
চলেছে পঙ্গু খঞ্জ, অন্ধ আতুর,
আর সাধুবেশী ধর্ম্মব্যবসায়ী,
দেবতাকে হাটে হাটে বিক্রয় করা যাদের জীবিকা।
সার্থকতা!
স্পষ্ট করে কিছু বলে না,—কেবল নিজের লোভকে
মহৎ নাম ও বৃহৎ মূল্য দিয়ে ওই শব্দটার ব্যাখ্যা করে,
আর শাস্তিশঙ্কাহীন চৌর্য্যবৃত্তির অনন্ত সুযোগ ও আপন মলিন
ক্লিন্ন দেহমাংসের অক্লান্ত লোলুপতা দিয়ে কল্পস্বর্গ রচনা করে।

দয়াহীন দুর্গমপথ উপলখণ্ডে আকীর্ণ।
ভক্ত চলেছে, তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ এবং শীর্ণ,
তরুণ এবং জরাজর্জ্জর, পৃথিবী শাসন করে যারা,
আর যারা অর্দ্ধাশনের মূল্যে মাটি চাষ করে।
কেউ বা ক্লান্ত বিক্ষতচরণ, কারো মনে ক্রোধ, কারো মনে সন্দেহ।
তারা প্রতি পদক্ষেপ গণনা করে আর শুধায়, কত পথ বাকি।
তার উত্তরে ভক্ত শুধু গান গায়।
শুনে তাদের ভ্রূ কুটিল হয়, কিন্তু ফিরতে পারে না,
চলমান জনপিণ্ডের বেগ এবং অনতিব্যক্ত আশার তাড়না
তাদের ঠেলে নিয়ে যায়।
ঘুম তাদের কমে এল, বিশ্রাম তারা সংক্ষিপ্ত করলে,
পরস্পরকে ছাড়িয়ে চলবার প্রতিযোগিতায় তারা ব্যগ্র,
ভয়, পাছে বিলম্ব করে বঞ্চিত হয়।
দিনের পর দিন গেল।
দিগন্তের পর দিগন্ত আসে,
অজ্ঞাতের আমন্ত্রণ অদৃশ্য সঙ্কেতে ইঙ্গিত করে।
ওদের মুখের ভাব ক্রমেই কঠিন
আর ওদের গঞ্জনা উগ্রতর হতে থাকে।

৬

রাত হয়েছে।
পথিকেরা বটতলায় আসন বিছিয়ে বসল।
একটা দমকা হাওয়ায় প্রদীপ গেল নিবে, অন্ধকার নিবিড়,
যেন নিদ্রা ঘনিয়ে উঠল মূর্চ্ছায়।
জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী, আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।

ভৎর্সনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জ্জন।
অবশেষে একজন সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে
হঠাৎ তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝরনার কলশব্দ দূরে থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।

৭

যাত্রীদের মন শঙ্কায় অভিভূত।
মেয়েরা কাঁদছে, পুরুষেরা উত্যক্ত হয়ে ভৎর্সনা করছে, চুপ করো।
কুকুর ডেকে ওঠে, চাবুক খেয়ে আর্ত্ত কাকুতিতে তার ডাক থেমে যায়।
রাত্রি পোহাতে চায় না।
অপরাধের অভিযোগ নিয়ে মেয়ে পুরুষে তর্ক তীব্র হতে থাকে।
সবাই চীৎকার করে, গর্জ্জন করে,
শেষে যখন খাপ থেকে ছুরি বেরোতে চায়
এমন সময় অন্ধকার ক্ষীণ হল,
প্রভাতের আলো গিরিশৃঙ্গ ছাপিয়ে আকাশ ভরে দিলে।
হঠাৎ সকলে স্তব্ধ;
সূর্য্যরশ্মির তর্জ্জনী এসে স্পর্শ করল
রক্তাক্ত মৃত মানুষের শান্ত ললাট।
মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল, পুরুষেরা মুখ ঢাকল দুই হাতে।
কেউ বা অলক্ষিতে পালিয়ে যেতে চায়, পারে না;
অপরাধের শৃঙ্খলে আপন বলির কাছে তারা বাঁধা।
পরস্পরকে তারা শুধায়, কে আমাদের পথ দেখাবে।
পূর্ব্ব দেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।

সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব,
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।
সকলে দাঁড়িয়ে উঠল কণ্ঠ মিলিয়ে গান করলে,
জয় মৃত্যুঞ্জয়ের জয়।

৮

তরুণের দল ডাক দিল, চলো যাত্রা করি,
প্রেমের তীর্থে, শক্তির তীর্থে,
হাজার কণ্ঠের ধ্বনিনির্ঝরে ঘোষিত হল—
আমরা ইহলোক জয় করব এবং লোকান্তর।
উদ্দেশ্য সকলের কাছে স্পষ্ট নয়, কেবল আগ্রহে সকলে এক,
মৃত্যুবিপদকে তুচ্ছ করেছে
সকলের সম্মিলিত সঞ্চলমান ইচ্ছার বেগ।
তারা আর পথ শুধায় না, তাদের মনে নেই সংশয়,
চরণে নেই ক্লান্তি।
মৃত অধিনেতার আত্মা তাদের অন্তরে বাহিরে ;
সে যে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়েছে
এবং জীবনের সীমাকে করেছে অতিক্রম।
তারা সেই ক্ষেত্র দিয়ে চলেছে যেখানে বীজ বোনা হল,
সেই ভাণ্ডারের পাশ দিয়ে, যেখানে শস্য হয়েছে সঞ্চিত,
সেই অনুর্বর ভূমির উপর দিয়ে
যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল;
তারা চলেছে প্রজাবহুল নগরের পথ দিয়ে,
চলেছে জনশূন্যতার মধ্যে দিয়ে
যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ;

চলেছে লক্ষ্মীছাড়াদের জীর্ণ বসতি বেয়ে
আশ্রয় যেখানে আশ্রিতকে বিদ্রূপ করে।

রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখের দীর্ঘ প্রহর কাটল পথে পথে।
সন্ধ্যাবেলায় আলোক যখন ম্লান তখন তারা কালজ্ঞকে শুধায়,
ঐ কি দেখা যায় আমাদের চরম আশার তোরণ-চূড়া।
সে বলে, না, ও যে সন্ধ্যাভ্রশিখরে
অস্তগামী সূর্য্যের বিলীয়মান আভা।
তরুণ বলে, থেমো না বন্ধু, অন্ধ তমিস্র রাত্রির মধ্য দিয়ে
আমাদের পৌঁছতে হবে মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে।
অন্ধকারে তারা চলে।
পথ যেন নিজের অর্থ নিজে জানে,
পায়ের তলার ধূলিও যেন নীরব স্পর্শে দিক চিনিয়ে দেয়।
স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের দল মূক সংগীতে বলে, সাথী অগ্রসর হও।
অধিনেতার আকাশবাণী কানে আসে, আর বিলম্ব নেই।

৯

প্রত্যুষের প্রথম আভা
অরণ্যের শিশিরবর্ষী পল্লবে পল্লবে ঝলমল করে উঠল।
নক্ষত্রসঙ্কেতবিদ জ্যোতিষী বললে, বন্ধু, আমরা এসেছি।
পথের দুইধারে দিক্‌প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান,—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দবাণী।
গিরিপদবর্ত্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্ত্তী গ্রাম পর্য্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জনস্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভ'রে যায় ছায়াপথ দিয়ে।
কিন্তু কোথায় রাজার দুর্গ, সোনার খনি,
মারণ-উচাটনমন্ত্রের পুরাতন পুঁথি?
জ্যোতিষী বললে, নক্ষত্রের ইঙ্গিতে ভুল হতে পারে না,
তাদের সংকেত এইখানেই এসে থেমেছে।
এই বলে ভক্তিনম্রশিরে
পথপ্রান্তে একটি উৎসের কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল।
সেই উৎস থেকে জলস্রোত উঠছে যেন তরল আলোক,
প্রভাত যেন হাসি-অশ্রুর গলিত মিলিত গীতধারায় সমুজ্জ্বল।
নিকটে তালিকুঞ্জতলে একটি পর্ণকুটির
অনির্বচনীয় স্তব্ধতায় পরিবেষ্টিত।
দ্বারে অপরিচিত সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে বলছে,
মাতা, দ্বার খোলো।

১০

প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্ন প্রান্তে
তির্য্যক হয়ে পড়েছে।
সম্মিলিত জনসঙ্ঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।
দ্বার খুলে গেল।
মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্য্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝঙ্কার, গান উঠল আকাশে,—
জয় হ'ক মানুষের, ঐ নব জাতকের, ঐ চিরজীবিতের।

সকলে জানু পেতে বসল রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী,
জ্ঞানী এবং মূঢ়—
উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে, জয় হ'ক মানুষের,
ওই নবজাতকের, ঐ চিরজীবিতের।

১০

মধ্যাদিনে যবে গান
বন্ধ করে পাখী,
হে রাখাল, বেণু তব
বাজাও একাকী ॥
প্রান্তরপ্রান্তের কোণে
রুদ্র বসি তাই শোনে
মধুরের-স্বপ্নাবেশে-
ধ্যানমগন-আঁখি—
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী ॥

সহসা উচ্ছ্বসি উঠে
ভরিয়া আকাশ
তৃষাতপ্ত বিরহের
নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস।
অম্বরপ্রান্তে যে দূরে
ডম্বরু গম্ভীর সুরে
জাগায় বিদ্যুৎ-ছন্দে
আসন্ন বৈশাখী—
হে রাখাল, বেণু যবে
বাজাও একাকী ॥

১১ আমি

আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, সুন্দর—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহঙ্কার,
অহঙ্কার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্ম্মার বিশ্বশিল্প।
তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে—
না, না, না,
না পান্না, না চুনি, না আলো, না গোলাপ,
না আমি, না তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে, 'আমি'।
সেই 'আমি'র গহনে আলো-আঁধারের ঘটল সঙ্গম,
দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস;
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ', মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে॥

একে বোলো না তত্ত্ব;
আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব-আমি'র রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি, পাত্রে নিয়ে রঙ॥

পণ্ডিত বলছেন—

বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,

মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে

পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।

একদিন দেবে চরম টান তার সাগরে পর্ব্বতে ;

মর্ত্ত্যলোকে মহাকালের নূতন খাতায়

পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,

গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;

মানুষের কীর্ত্তি হারাবে অমরতার ভান,

তার ইতিহাসে লেপে দেবে

অনন্ত রাত্রির কালি।

মানুষের যাবার দিনের চোখ

বিশ্ব থেকে নিকিয়ে নেবে রঙ,

মানুষের যাবার দিনের মন

ছানিয়ে নেবে রস।

শক্তির কম্পন চলবে আকাশে আকাশে,

জ্বলবে না কোথাও আলো।

বীণাহীন সভায় যন্ত্রীর আঙুল নাচবে,

বাজবে না সুর।

সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে

নীলিমাহীন আকাশে

ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।

তখন বিরাট বিশ্বভুবনে

দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে

এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই—

"তুমি সুন্দর,"

"আমি ভালোবাসি"।

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে

যুগযুগান্তর ধ'রে—

প্রলয়সন্ধ্যার জপ করবেন
"কথা কও, কথা কও",
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর",
বলবেন "বলো, আমি ভালোবাসি" ?

১২

নীলাঞ্জনছায়া,
প্রফুল্ল কদম্ববন,
জম্বুপুঞ্জে শ্যাম বনান্ত
বনবীথিকা ঘনসুগন্ধ।
মন্থর নব নীলনীরদ-
পরিকীর্ণ দিগন্ত।
চিত্ত মোর পন্থহারা
কান্তাবিরহকান্তারে।

১৩

সে দিন দুজনে দুলেছিনু বনে,
ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।
এই স্মৃতিটুকু কভু খণে খণে
যেন জাগে মনে, ভুলো না

সে দিন বাতাসে ছিল তুমি জান,
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,
আকাশে আকাশে আছিল ছড়ানো
তোমার হাসির তুলনা॥

যেতে যেতে পথে পূর্ণিমারাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।

এখন আমার বেলা নাহি আর,
বহিব একাকী বিরহের ভার—
বাঁধিনু যে রাখী পরানে তোমার
সে রাখী খুলো না, খুলো না ॥

১৪

ঘুমের ঘন গহন হতে
যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।

শমীশাখার বক্ষ হতে
যেমন জ্বলে অগ্নি
তেমনি তুমি এসো এসো ॥

ঈশানকোণে কালো মেঘের
নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ

তেমনি তুমি চমক হানি
এসো হৃদয়তলে—
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো এসো ॥

আঁধার যবে পাঠায় ডাক মৌন ইশারায়
যেমন আসে কালপুরুষ সন্ধ্যাকাশে
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো।

সুদূর হিমগিরির শিখরে
মন্ত্র যবে প্রেরণ করে তাপস বৈশাখ
প্রখর তাপে কঠিন ঘন তুষার গলায়ে,

বন্যাধারা যেমন নেমে আসে,
তেমনি তুমি এসো, তুমি এসো এসো ॥

১৫

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

১৬

রূপনারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ,
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে
বেদনায় বেদনায় ;
সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,
সে কখনো করে না বঞ্চনা।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮—১৯৪৬)

১৭ মধ্যরাত্রি

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জেবলে মোর প্রাণে
আলো ভরা দুটি কালো তারা।

১৮ ব্যর্থজীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে
হৃদয় ভাঙেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে।

চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজলাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্র কন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে !

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব ॥

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নাহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি কভু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১—১৯৫১)

১৯ কুঁকড়ো

সোনালিয়া,
প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি,
আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না,
সুর আপনি ওঠে আমার মধ্যে মাটি থেকে লতায় পাতায়
রস যেমন ক'রে উঠে আসে,
গানও তেমনি ক'রে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি,
জন্মভূমির বুকের রস।
পুব আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে,
ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর
আর গান,
বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়,
আর আমি বুঝি,
আমি না হ'লে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর
বুকের কথা খুলে বলাই হবে না।
সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই,
মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই,
আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মতো
নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ ক'রে বাজাতে থাকে,
আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখি নই,
আমি যেন একটি আশ্চর্য্য বাঁশি,
যার মধ্য দিয়ে
পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে।

অন্ধকারের মধ্য থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে
আকাশের কাছে তার অর্থ কী সোনালিয়া,
সে আলো ভিক্ষে করছে,

একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা,
ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে,
আলো চেয়ে,
গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদছে আর বলছে,
আলো দিয়ে ফোটাও।
ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে, চাষারা ভুলে এসেছে,
সে ভিজে মাটিতে প'ড়ে মরচে ধ'রে মরবার ভয়ে চাচ্ছি আলো,
একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রঙে
চারদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়।

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক,
আমার বুকের তলা পর্য্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক।
সব জিনিস চাচ্ছে যেন আপন আলোয় তাদের রঙ ফিরে পায়,
আপনার আপনার হারানো ছায়া ফিবে পায়,
তারা সারা রাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে,
আলো কী দোষে হারালেম।

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি,
আমি শুনতে পাই ধান খেত সব কাঁদছে,
শরতের আলোয় সোনার ফসল ভ'রে উঠবার জন্যে,
রাঙা মাটির পথ সব কাঁদছে,
যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ
বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়।
শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলায়
গোল গোল হাড়িগুলি পর্য্যন্ত
আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি।
বনে বনে সূর্য্যের আলোয় কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে,
জেগে উঠতে,
কে না আলোর জন্যে কাঁদছে সারা রাত।

এই জগৎ শুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা
এক হ'য়ে যখন আমার কাছে আসে,
তখন আমি আর ছোটো পাখিটি থাকিনে,
বুক আমার বেড়ে যায়,
সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে, শুনি,
আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে তারপর আমার গান ফোটে,
"আলোর ফুল !"
আর তাই শুনে পূবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভ'রে উঠতে থাকে,
কাক সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর
চেপে দিতে চায়,
কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি,
আকাশে কাগডিমে রঙ লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল,
তারপর হঠাৎ চমকে দেখি
আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হ'য়ে গেছে,
আর আকাশে আলোর জবা ফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি
আমি,
পাহাড় তলির কুঁকড়ো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮—১৯৪৮)

২০ যৌবন চাঞ্চল্য

ভুটিয়া যুবতী চলে পথ;
আকাশ কালিমামাখা কুয়াশায় দিক্ ঢাকা,
চারিধারে কেবলই পর্বত;
যুবতী একেলা চলে পথ।

এদিক ওদিক চায় গুণগুণি' গান গায়,
কভু বা চমকি চায় ফিরে';
গতিতে ঝরে আনন্দ উথলে নৃত্যের ছন্দ
আঁকা-বাঁকা গিরি-পথ ঘিরে'।
ছুটিয়া যুবতী চলে পথ !

টস্ টসে রসে ভরপুর—
আপেলের মত মুখ আপেলের মত বুক
পরিপূর্ণ প্রবল প্রচুর ;
যৌবনের রসে ভরপুর
মেঘ ডাকে কড়্ কড়্ বুঝি বা আসিবে ঝড়,
একটু নাহিক ডর তা'তে ;
উঘারি' বুকের বাস, পুরায় বিচিত্র আশ
উরস পরশি' নিজ হাতে !

অজানা ব্যথায় সুমধুর—
সেথা বুঝি করে গুরুগুরু !
যুবতী একেলা পথ চলে ;
পাশের পলাশ-বনে কেন চায় অকারণে ?
আবেশে চরণ দু'টি টলে—
পায়ে-পায়ে বাধিয়া উপলে !

আপনার মনে যায় আপনার মনে গায়,
তবু কেন আনপানে টান ?
করিতে রসের সৃষ্টি চাই কি দশের দৃষ্টি ?
—স্বরূপ জানেন ভগবান !

সহজে নাচিয়া যেবা চলে
একাকিনী ঘন বনতলে—
জানিনাকো তারো কি ব্যথায়
আঁখিজলে কাজল ভিজায় ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২)

২১ দূরের পাল্লা

(অংশ)

ছিপ্‌খান্‌ তিন-দাঁড়—
তিনজন মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর পাল্লা।

কশ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ—ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

রূপশালি ধান বুঝি
এই দেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি।

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোম্‌রা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোম্‌রা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

*   *

পান সুপারি ! পান সুপারি !
এই খানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেরই শিন্নি মেনে
চল্ রে টেনে বৈঠা হেনে ;
বাঁক সমুখে, সাম্‌নে ঝুঁকে,
বাঁয় বাঁচিয়ে, ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বৈঠা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থম্‌কে গেল।
জম্‌জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এলো, রাত্রি এলো
ঝাপসা আলোয় চরের ভিতে
ফিরছে কারা মাছের পাছে,
পীর বদরের কুদ্‌রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে।

*   *   *

লক্ লক্ শর-বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্‌চাপ চারদিক্
সন্ধ্যার লগ্ন।

চারদিক্ নিঃসাড়,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্‌খান্ তিন-দাঁড়,
চারজন যাত্রী।

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাউয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে

ঝিমায় ঝুঁঝি ঝিঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরান টানে।
তারায় ভরা আকাশ ও কি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ মন্ত্র-ভরে !

* * *

কেবল তারা ! কেবল তারা !
শেষের শিরে মাণিক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাহি।
কোথায় এলো নৌকোখানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নৌকো চলে আকাশ চিরে !

* * *

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা।
চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্‌ভিলে হাঁস তায়
জল-গায় চড়্‌ছে।
ওই মেঘ জম্‌ছে,
চল ভাই সম্‌ঝে,
গাও গান, দাও শিশ্—
বক্‌শিশ্ ! বক্‌শিশ্ !

খুব জোর ডুব-জল,
বয় স্রোত ঝিরঝির্,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় দূর নয় তীর।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্তি,—
বক্‌শিশ্ টঙ্কা,
বক্‌শিশ্ ফুর্তি।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউগাছ দুল্‌ছে,
ঢোল-কলমীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্‌ছে।

২২ ইল্‌শে গুঁড়ি

ইল্‌শে গুঁড়ি! ইল্‌শে গুঁড়ি!
ইলিশ মাছের ডিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি ইল্‌শে গুঁড়ি
দিনের বেলায় হিম।

কেয়াফুলে ঘুণ লেগেছে
পড়তে পরাগ মিলিয়ে গেছে,
মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আলতা-পাটি শিম।
ইল্‌শে গুঁড়ি! হিমের কুঁড়ি,
রোদ্দুরে রিম্ ঝিম্।

হাল্‌কা হাওয়ায় মেঘের ছাওয়ায়
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচন দেখে
নাচ্‌ছে ইলিশ মাছ।
কেউবা নাচে জলের তলায়,
ল্যাজ তুলে কেউ ডিগ্‌বাজী খায়,
নদীতে ভাই! জাল নিয়ে আয়,
পুকুরে ছিপ গাছ।
উল্‌সে ওঠে মনটা, দেখে
ইল্‌শে গুঁড়ির নাচ।

ইল্‌শে গুঁড়ি— পরীর ঘুড়ি,—
কোথায় চলেছে?
ঝুমরো চুলে ইল্‌শে গুঁড়ি
মুক্তো ফলেছে!
ধানের বনের চিংড়ি গুলো
লাফিয়ে ওঠে বাড়িয়ে নুলো;
ব্যাঙ ডাকে ওই গলা ফুলো,
আকাশ গলেছে;
বাঁশের পাতায় ঝিমোয় ঝিঁঝি
বাদল চলেছে।

মেঘায় মেঘায় সূর্যি ডোবে
জড়িয়ে মেঘের জাল,
ঢাক্‌লো মেঘের খুঞে-পোশে
তাল-পাটালির থাল!
লিখ্‌ছে যারা তালপাতাতে
খাগের কলম বাগিয়ে হাতে,

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ সংবাদ কহি য়া কানে তার, হায়, বিল ম্বর সময় নাই;
বন্ধের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল ত র কতই আর ?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক চোক্ ;
চঞ্চল খঞ্জন-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক গান,
বর্ষার সৌরভ, বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ !

পুষ্পের তৃষ্ণার করহে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায়, হায় মেঘ ! প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ,
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক" বন্ধু ! বন্ধুর আশিস্ লও।

সুকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৭—১৯২৩)

২৪ শব্দকল্পদ্রুম !

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্‌কা,—
ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা !
শাঁই শাঁই পন্‌পন্, ভয়ে কান বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ ?
হুড়মুড় ধুপ্ ধাপ—ও কি শুনি ভাই রে !
দেখছ না হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্। ঝুপ্ ঝাপ্ ঝপা—স্।
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল ?—গব্ গব্ গবা—স্।

খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ঐ রে।
দুড়্ দাড়্ চুরমার—ঘুম ভাঙে কই রে।
ঘর্ঘর ভন্‌ভন্ ঘোরে কত চিন্তা।
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্‌তা!
ঠুং ঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজে রে!
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্ মার্, 'বাপ্ বাপ্' চীৎকার—
মালকোঁচা মারে বুঝি? স'রে পড় এইবার!

২৫ রামগরুড়ের ছানা

রামগরুড়ের ছানা হাস্‌তে তাদের মানা
হাসির কথা শুনলে বলে,
"হাস্‌ব না না, না না!"
সদাই মরে ত্রাসে— ঐ বুঝি কেউ হাসে!
এক চোখে তাই মিট্‌মিটিয়ে
তাকায় আশে পাশে।
ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব'কে ব'কে
আপনারে কয়, "হাসিস্ যদি
মারব কিন্তু তোকে।"
যায় না বনের কাছে, কিম্বা গাছে গাছে,
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে!
সোয়াস্তি নেই মনে— মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে
কান পেতে তাই শোনে!
ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

হাস্‌তে হাস্‌তে যারা হচ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগ্‌ছে ব্যথা
বুঝছে না কি তারা ?
রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা।

২৬ হুলোর গান

বিদঘুটে রাত্তিরে ঘুটঘুটে ফাঁকা,
গাছপালা মিশ্‌মিশে মখমলে ঢাকা,
জট বাঁধা ঝুল কালো বটগাছ তলে,
ধক্‌ ধক্‌ জোনাকির চকমকি জ্বলে,
চুপ্‌চাপ চারদিকে ঝোপঝাড় গুলো—
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে,
কোন্‌ গানে মন ভেজে শোন্‌ বলি তোরে—
পূবদিকে মাঝ রাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্‌ ক'রে মনে পড়ে মটকার কাছে
মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড় দুড় ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী।
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক্‌ ক'রে নিভে গেল বুক ভরা আশা।
মন বলে আর কেন সংসারে থাকি
বিল্‌কুল্‌ সব দেখি ভেল্কির ফাঁকি।

সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি,
গিন্নির মুখ যেন চিমনির কালি।
মন ভাঙা দুখ মোর কণ্ঠেতে পুরে
গান গাই আয় ভাই প্রাণফাটা সুরে।

২৭

শুনেছ কি ব'লে গেল সীতানাথ বন্দ্যো ?
আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ ?
টকটক থাকে নাকো হ'লে পরে বৃষ্টি—
তখন দেখেছি চেটে একেবারে মিষ্টি।

২৮ আবোল তাবোল

মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে,
রামধনুকের আবছায়াতে,
তাল বেতালে খেয়াল সুরে
তান ধরেছি কণ্ঠ পুরে।
হেথায় নিষেধ নাই রে দাদা
নাইরে বাধন নাইরে বাধা।
হেথায় রঙিন আকাশ তলে
স্বপন দোলা হাওয়ায় দোলে,
সুরের নেশায় ঝরণা ছোটে,
আকাশ কুসুম আপনি ফোটে,
রঙিয়ে আকাশ রঙিয়ে মন
চমক জাগে ক্ষণে ক্ষণ।
আজকে দাদা যাবার আগে
বল্‌ব যা মোর চিত্তে লাগে—
নাইবা তাহার অর্থ হোক্‌,
নাইবা বুঝুক বেবাক্‌ লোক।
আপনাকে আজ আপন হ'তে
ভাসিয়ে দিলাম খেয়াল স্রোতে।

ছুট্‌লে কথা থামায় কে ?
আজকে ঠেকায় আমায় কে ?
আজকে আমার মনের মাঝে
ধাঁই ধপাধপ্‌ তব্‌লা বাজে—
রাম-খটাখট্‌ ঘ্যাঁচাং ঘ্যাঁচ্‌
কথায় কাটে কথার প্যাঁচ্‌।
আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার !
গোপন প্রাণে স্বপন দূত,
মঞ্চে নাচেন পঞ্চ ভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষীরাজ—
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিম কালের চাঁদিম হিম
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এলো ঘুমের ঘোর
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৮—)

২৯ দুখবাদী

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যেজন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ।
সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল !
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
ভেলে সিন্দুরে এ সৌন্দর্য্য 'ভরি' ভুলিবার নয়;
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।

অতল দুঃখ-সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে' গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ-আড়ে যারা হাবুডুবু খায়.
তাদের বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ-সুষমায় ?

বজ্র যেজনা মরে,
নবঘন-শ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে ?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,—
মলয়-ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে।
ফাল্গুনে হেরি নব কিসলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুল দল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী !

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি ত জানো,
একা বসে' যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।
জমাখরচের কৈফাৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত,
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল,—অন্তরে বুঝেছি ত !
বজায় থাকিতে খ্যাতি,—
সহসা জ্বালাবে কোন সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি !
সুখে মোড়া দুখে ভরা কত বড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মাণ্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন্ মাকাল ফল।
সৌন্দর্য্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বোলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা

বাহিরে এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।

চটক বা চখা কি জানে প্রেমের ? বকে কি শিখাবে ধর্ম্ম ?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন-মর্ম্ম !
অরণ্য তরু জপিছে অশ্ব ঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম !
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধোরে রঙিন্ বারাঙ্গনা !
খাদ্যে-খাদকে বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য,
ষড়্-ঋতু ছলে ষড়্‌রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য্য।
ছলে বলে কলে দুর্ব্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার !

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া রয়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে।
কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে জড়;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন্ সুখ;
সত্য সত্য সহস্র গুণ সত্য জীবের দুখ !

সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

৩০ দেশোদ্ধার

বার বার তিনবার,—
এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার !
শোন্ রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিয়া বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।

তোদের দুঃখে হায়,—
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
কোরো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ভাই ঘষিনি লঙ্কা ;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।

ওরে চির পরাধীন !
তোরা না জানিস্ মোরা জানি তোর কি কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি পড়ে' পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তের আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন !

তোরাই যে ভাই দেশ ;—
তোদের দৈন্য-জন্য মায়ের কঙ্কাল অবশেষ।
মহার্ঘ্য হ'লে বেগুন পালঙ
যদিও ভিতরে চটে' হই টং,
তবু তোর সেবা দেশেরই যে সেবা মনে মনে বুঝি বেশ।

ওরে নাবালক চাষা !
আমরা তোদের ভাঙাব নিদ্রা মূক মুখে দিব ভাষা।
শ্রমিক চাষার দুঃখে ফন্দ
রচিতে ছুটিব লিলুয়া খড়্দ।
গড়িয়া আইন ভাঙি বে-আইন জাগাইব নব আশা !

ওরে ওঠ্ ওঠ্ জেগে ;—
তরুণ অরুণ আলোকে জানা ও অজানা ব্যথায় লেগে !
সবলে স্কন্ধে তুলে নিয়ে হল
প'াচনে খেদায় বলদের দল
প্রভাতের মাঠে কলকোলাহলে দল বে'ধে চ

জুড়ে দে লাঙল কসে' ;
ফালের আগায় যত উ'চু নীচু সমভূম্ কর চষে'।
মাথা উ'চু ক'রে আছে ঢ্যালাগুলো,
মই-এর চাপনে ক'রে দে' রে ধুলো ;
কাঁটার বংশ কর্ রে ধ্বংস জোএ জোএ বিদে ঘষে'।

ফসল হবেই হবে !
আকাশ হইতে না নামে বৃষ্টি, পাতাল ফু'ড়িবি তবে।
আপনার হাতে বুনেছিস যা'কে,
টেনে তুলে' বলে রু'য়ে দিবি পাঁকে ;
বাজিবে মাদল ঝরিবে বাদল বর্ষার উৎসবে।

সেই দুর্যোগ-উৎসব যবে ঘনাইবে চারিধার,
মেঘে ঝড়ে জলে বজ্রে বাদলে রচিয়া অন্ধকার ;—
সরে' পড়ি যদি ক্ষমা কোরো দাদা
খাঁটি চাষা ছাড়া কে মাখিবে কাদা ?
মনে কোরো ভাই মোরা চাষা নই ;—চাষার ব্যারিষ্টার !

৩১ কবির কাব্য

সন্দেহ হয় পেয়েছ বন্ধু, কবির কু-অভ্যাস ;—
যত দুখ পাও [illegible] সুরে গাও দুঃখেরি ইতিহাস।
কবির সে দুখ গান,
শুনি [illegible] কানে যিনি প্রাণে প্রাণে যত বেশী সুখ পান
তিনি ভক্ত অনুরক্ত রসিক ভক্ত সমেজদার।
কবির বুকের দুখের কাব্য ভক্তে চমৎকার।
মেঘে মেঘে বাজে গুরু ক্রন্দন,—বনে বনে শিখি নাচে ;
বুক ফেটে তার ঝরে আঁখি জল,—তৃষিত চাতক বাঁচে।
জ্বলিয়া জ্যোৎস্না মরীচিকা বুকে মরুচন্দ্র সে জাগে
পিয়াসী চকোর তাপিত পাপিয়া তারি পাশে সুধা মাগে
মূক কাননের মনের আগুন ফুটিলে ফাগুন-ফুলে,
দিকে দিকে দিকে রসিক ভ্রমর স্তবগুঞ্জন তুলে।
মহাসিন্ধুর প্রণয়ের টানে নদী পথে কেঁদে যায়,
নিরুপায় জেনে প্রতি তটতৃণে আঁকড়ি ধরিতে চায়।
যত বেলা উঠে তপনের ফুটে বহিরন্তর দাহ,
সোহাগী কমল ডুবাইয়া গলা কহে—বঁধু ফিরে চাহ।
দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যু শয়ন রক্ত বমন করে,
উঠে ত্রিভুবন ভরিয়া তখন বৃথা গায়ত্রী গান ;
রাত্রি আসিয়া ঢেকে দেয় সেই অযাচিত অপমান।
সেই রাত্রির তারায় তারায় জ্বলে অসংখ্য জ্বালা,
আঁধার আঁচলে নিশার অশ্রু—ঊষার শিশির-মালা।

এমনি বন্ধু ভুবনে ভুবনে চলিতেছে লুকোচুরি,
অন্তর-তারে ব্যথার কাঁপন সুরের মোড়কে মুড়ি'।
প্রকাশিতে নয়,—করিতে গোপন প্রাণের গভীর ব্যথা,
ওগো মহাকবি, রচিয়াছ বুঝি এই মহা-উপকথা ?
তথাপি বন্ধু নিঠুর সত্য নিখুঁত পড়েনি ঢাকা,
ফুলে ফুলে বুঝি তোমারি দীর্ণ-হৃদয়-রক্ত মাখা !

চোখে চোখে ঝরে কার যে অশ্রু বুঝেও বুঝিনে কেউ,
বুকে বুকে ভাঙে কোন সে অতল বুকের দুখের ঢেউ ?
কণ্ঠে কণ্ঠে কে কণ্ঠহীন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠে !
মরণে মরণে তিল তিল করি কোন্ মহাপ্রাণ টুটে ?

আছে গো আছেও সুখ;—
খদ্যোৎ বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ !
মাঝে মাঝে মৃগতৃষিকা বিনা কে মাপে মরুর তৃষা !
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারাব দিশা !
বন্ধু, বন্ধু, হে কবিবন্ধু, উপমার ফাঁস গুণি'
আসল কথাটা চাপা দিতে ভাই কাব্যের জাল বুনি।

সুধীরকুমার চৌধুরী (১৮৯৭-)

৩২ একটি নিমেষ

আজি এ নিমেষখানি উতরিল এসে চুপে চুপে,
কি নিবিড় পূর্ণতার রূপে
নিভৃত এ হৃদিতটে এসে।
বুকে নিয়ে এল ভালবেসে
অসীমের যত পণ্য। অনাদির যত আয়োজন,
একটি নিমেষ-বৃন্তে ফুটি' উঠি' ফুলের মতন
রহিয়াছে স্থির,
অন্তহারা তপোনিষ্ঠা বারে বারে টুটিছে সৃষ্টির !
নিতল এ নভোতলে শরতের মেঘ-আলিপন,
নত করবীর শাখা, রৌদ্র-দীপ্ত গৃহের প্রাঙ্গণ,
নিদ্রাতুর সারমেয়, উড়ে যাওয়া চিলের ছায়াটি,
পাতা-খোলা বইখানা, কাপড় কোঁচানো পরিপাটি,

কিছু নহে মিছে,—
স্নেহভরা কার দুটি নয়নে জাগিছে
সবে এরা।
পথে পথিকের চলাফেরা,
ও বাড়ীতে ছেলেদের সুর করে ধারাপাত শেখা,
এরও লাগি অনাদির যুগে যুগে কত স্বপ্ন দেখা,
অধীর প্রতীক্ষা কত কল্প কল্প ধ'রে!
তরুতলে পাতার মর্ম্মরে,
গাড়ীর চাকার শব্দে, কামারের হাতুড়ির ঘায়,
নারীর কলহে আর শিশুর কান্নায়
ধ্বনিতেছে যেই মূর্চ্ছনা,
তারে ছেড়ে কোনোমতে চলিত না,
এ বিশ্বের সংগীত-সাধন,
ব্যর্থ হয়ে যেত তার যুগান্তের যত আয়োজন।

পরিপূর্ণ একটি নিমেষে
নিজেরে হেরিনু পরিপূর্ণতার রাজরাজ-বেশে
আমি আছি,—চূড়ান্ত এ অধিকারে গণি,
আমি বিশ্ব-দেবতার নয়নের মণি।

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)

৩৩ প্রলয়োল্লাস

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌!!

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশায় নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—
ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আসছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

ঝামর তাহার কেশর দোলায় ঝাপ্টা মেরে গগন দুলায়,
সর্ব্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় ।
বিশ্বপিতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে
দোদুল্ দোলে !
অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন-কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে
কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর পর—
হাঁকে ঐ "জয় প্রলয়ঙ্কর !"
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে !
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে !
এবার মহা-নিশার শেষে
আস্‌বে উষা অরুণ হেসে
করুণ বেশে !
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত-চাবুক হানে,
ধ্বনিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে !
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেবতা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে
পাষাণ-স্তূপে !
এই ত রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ধ্বংস দেখে ভয় হয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে !
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌ !!

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !—
বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্ !
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !!

৩৪

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবব
ঝমঝম, বমঝম, ঝমঝম ॥

শিয়রে বসি' চুপি' চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ সম, নিরুপম, মনোরম ॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি ডালি দিনু ঢালি, দেবতা মোর !
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুলি খোঁপা খুলি কুসুম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি,
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম ॥

৩৫ চোর ডাকাত

তোমায় কে বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে !
চোর ডাকাতের করিছে বিচার কোন্ সে ধর্ম্মরাজ ?
জিজ্ঞাসা কর, বিশ্ব জুড়িয়া কে নহে দস্যু আজ ?
বিচারক ! তব ধর্ম্মদণ্ড ধর,
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড় !
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি সঙ্ঘেতে আজ।
রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইঁটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
দিব্যি পেতেছ খল কল্, ও'লা মানুষ-পেষানো কল,
আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল !
কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কল-ওয়ালা
ভরিছে তাহার মদিরা-পাত্র, পুরিছে স্বর্ণ-জালা !
বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফুলে মহাজন-ভুঁড়ি
নিরন্নদের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে জুড়ি !
পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়,
নাচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়।
অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল-কিছু,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই
দিকে দিকে আজ অর্থ-পিশাচ খুঁড়িয়াছে গড়খাই।
জগৎ হয়েছে জিন্দানখানা, প্রহরী যত ডাকাত—
চোরে চোরে এরা মাস্‌তুতো ভাই, ঠগে ও ঠগে শ্যাঙাৎ।
কে বলে তোমায় ডাকাত বন্ধু, কে বলে করিছ চুরি ?
চুরি করিয়াছ টাকা, ঘটি, বাটি, হৃদয়ে হান নি ছুরি !
ইহাদের মত অমানুষ নহ, হতে পার তস্কর,
মানুষ দেখিলে বাল্মীকি হও তোমরা রত্নাকর !

৩৬। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

১

দুর্গম গিরি, কান্তার, মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হা'ল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

২

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান !
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদের পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

৩

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ !
"হিন্দু না ওরা মুস্লিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

৪

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাত-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ ॥
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি' নিয়াছ যে মহাভার !

৫

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্ব্বার।

৬

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ !
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার !

৩৭

দুরন্ত বায়ু পুরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে ॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে ॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সে তারা চন্দে ॥

মালঞ্চে একি ফুল খেলা, আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী সঙ্গে মাতি, কদম্ব-গন্ধে ॥

একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয়া কেয়া-বেণীর বন্ধে ॥

দিনান্তে বসি' কবি একা পড়িস্, কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে ॥

৩৮ প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়—

যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায় !

যায় প্রবীণ
চৈতী-বায়
আয়-নবীন
শক্তি আয় !
যায় অতীত,
যায় পতিত,
'আয় অতিথ,
আয়রে আয়—'
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায় !

ঐ রে দিক-
চক্রে কার
বক্র পথ
ঘুর-চাকার।
ছুটছে রথ,
চক্র ঘায়
দিগ্বিদিক্
মূর্চ্ছা যায় !
কোটী রবি শশী ঘুর পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ-বিভোল,—
"কাল"-কোলে "আজ" খায় রে দোল !
আজ প্রভাত
আনছে কা'ল,

দূর পাহাড়—
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়ছে কার
কিংশুকের
ফুল-শাখায়।
ঘুরছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচ্ ছে কার
ঐ ঊষার
লাল আভায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!

গর্জ্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্ত্তমান।
আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাখায়!
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচছে কাল
　　থৈ তা থৈ।
কই সে কই
　　চক্রধর,
ঐ মায়ায়
　　খণ্ড কর,
শব-মায়ায়
　　শিব যে যায়
ছিন্ন কর
　　ঐ মায়ায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়!

জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-)

৩৯ বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য্য; অতি দূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৪০ হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ
মনে আসে!
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে
দূরে;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে!

৪১ বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়:
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে;
কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে পিছনে চলেছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে
লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

৪২ হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত;
সারা রাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনো বিছানা ছিঁড়ে
নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে;
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁসে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো
উড়ছে সে!
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল!

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল—আকাশে এক তিল
ফাঁক ছিল না;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর
দেখেছি আমি;
অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা
চোখের মতো ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা;
জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ !
কাল এমন আশ্চর্য্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ
সঙ্গে করে এনেছে;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূরে আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ
বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন;
আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল !
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই শাঁই করে,
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো !

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জ্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দ্দান্ত নীল মত্ততায় !

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্র স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

৪৩ সমারূঢ়

বরং নিজেই তুমি লেখনাক' একটি কবিতা
বলিলাম ম্লান হেসে;—ছায়াপিন্ড দিল না উত্তর;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়,— সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পান্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
ব'সে আছে সিংহাসনে,—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;
বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি;
যদিও সে সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিল;—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি।

৪৪ আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেওনাক' তুমি,
ব'লো নাক' কথা ওই যুবকের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা;
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেওনাক’ আর।

কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মত তুমি আজ;
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস ;
বাতাসের ওপারে বাতাস,—
আকাশের ওপারে আকাশ।

৪৫ আট বছর আগের একদিন

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ’ল তার সাধ;

বধূ শুয়েছিল পাশে—শিশুটিও ছিল;
প্রেম ছিল, আশা ছিল—জ্যোৎস্নায়,—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল,—লাসকাটা ঘরে
শুয়ে ঘুমাব এবার।

এই ঘুম চেয়েছিল বুঝি।
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মত ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এইকথা বলেছিল তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মত কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারীর ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সংঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।
রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করে নি কি প্রতিবাদ ?   জোনাকীর ভিড় এসে সোনালি
ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করে নি কি মাখামাখি ?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলে নি কি : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার !—
ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার !'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার ?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল ;—

মর্গে কি হৃদয় জুড়োল
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মত রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ;—কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু,—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;

অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;—
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে বসে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয় : 'বুড়ী চাঁদ গেছে বুঝি
বেনো জলে ভেসে ?
চমৎকার !
ধরা যাক দু' একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার ?
আমিও তোমার মত বুড়ো হব—বুড়ী চাঁদটারে আমি
ক'রে দেব কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দুজনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাব জীবনের
প্রচুর ভাঁড়ার।

৪৬ পাখীরা

ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে,-
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি;

—এখন সে কত রাত !
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর,—
 স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।
তার পর চ'লে যায় কোথায় আকাশে ?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।
শরীরে এসেছে স্বাদ বসন্তের রাতে
 চোখ আর চায় না ঘুমাতে;
জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
 সাগরের জলের বাতাসে
 আমার হৃদয় সুস্থ হয়;
সবাই ঘুমায়ে আছে সব দিকে,—
সমুদ্রের এই ধারে কাহাদের নোঙরের হয়েছে সময় ?

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
 কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
 এই সব পাখী ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে দলে সমুদ্রের 'পর
 নেমেছিল তারা তারপর,—
মানুষ যেমন তার মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে !
বাদামি-সোনালি—সাদা—ফুট্‌ফুট্‌ ডানার ভিতরে
 রবারের বলের মতন ছোট বুকে
 তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
 যেমন অতল সত্য হ'য়ে !

কোথাও জীবন আছে,—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে,
কোথাও নদীর জল র'য়ে গেছে—সাগরের তিতা ফেনা নয়
 খেলার বলের মত তাদের হৃদয়

এই জানিয়াছে;—
কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তা'রা আসিয়াছে।
তারপর চ'লে যায় কোন এক ক্ষেত্রে
তাহার প্রিয়ের সাথে আকাশের পথে যেতে যেতে
সে কি কথা কয়?
তাদের প্রথম ডিম জন্মিবার এসেছে সময়!
অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর!

আজ এই বসন্তের রাতে
ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে;
অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,—
আকাশে পাখীরা কথা কয় পরস্পর।

৪৭ শকুন

মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে, মানুষ দেখেছে হাট ঘাঁটি বস্তি;—নিস্তব্ধ প্রান্তর
শকুনের; যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে

আরেক আকাশ যেন,—সেইখানে শকুনেরা একবার নামে পরস্পর
কঠিন মেঘের থেকে;—যেন দূর আলো থেকে ধূম্র ক্লান্ত দিক্‌হস্তিগণ
প'ড়ে গেছে; প'ড়ে গেছে পৃথিবীতে এশিয়ার ক্ষেত মাঠ প্রান্তরের পর

এইসব ভ্রান্ত পাখী কয়েক মুহূর্ত শুধু;—আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে,—পাহাড়ের শিঙে শিঙে সমুদ্রের পারে
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে,—বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই;—একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়; কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখীদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে;

যেন কোন বৈতরণী—অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হূন।

৪৮ নগ্ন নির্জ্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে :
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে,
অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,
সেই নারীর মতো
ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা
সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারত-সমুদ্রের তীরে
কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে
অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে

আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,
কোন্ এক প্রাসাদ ছিল;
মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ ঃ
পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন্ তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,
আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্নআকাঙ্ক্ষা,
আর তুমি নারী—
এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,
মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক;

অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল,
অনেক কমলা রঙের রোদ;
আর তুমি ছিলে;
তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,
খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সে সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

পর্দ্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !
তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত;

তোমার নগ্ন নির্জ্জন হাত।

জসীম উদ্‌দীন (তারিখ জানাননি)

৪৯ রাখালী

এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো,
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
রানতে ব'সে, জল আনিতে, সকল কাজেই হাসি যে তার,
এই নিয়ে সে অনেক বারই মায়ের কাছে খেয়েছে মার।
সান্ করিয়া ভিজে চুলে কাঁখে ভরা ঘড়ার ভারে,
মুখের হাসি দ্বিগুণ ছোটে কোন মতেই থাম্‌তে নারে।
এই মেয়েটি এম্‌নি ছিল যাহার সাথেই হ'ত দেখা
তাহার মুখেই এক নিমেষে ছড়িয়ে যেত হাসির রেখা।
মা বলিত, বড়ুরে তুই মিছি মিছি হাসিস্ বড়,
এ শুনেও সারা গা তার হাসির চোটে নড় নড় !
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার, না সে আবীর,
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙিন রবির।
কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁট্‌টি তাহার,
মাঠে-ফোটা কল্‌মি ফুলে কতটা তার খেলে বাহার।
গালটি তাহার এমন পাতল ফু'য়েই যেন যাবে উড়ে
দু একটি চুল এলিয়ে পড়ে মাথার সাথে রাখছে ধ'রে।
সাঁঝ সকালে এ-ঘর ও-ঘর ফির্‌ত যখন হেসে খেলে !
মনে হ'ত ঢেউয়ের জলে ফুলটিরে কে গেছে ফেলে !

ওই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে ও-পথ দিয়ে চল্‌তে ধীরে
ওই মেয়েটির রূপের গাঙে হারিয়ে গেল কলসীটিরে।
দোষ কি তাহার ? ওই মেয়েটি মিছি মিছি এমনি হাসে,
গাঁয়ের রাখাল !—অমন রূপে কেমনে রাখে পরাণটা সে ?
এ পথ দিয়ে চল্‌তে তাহার কোঁচার হুড়ুম যায় যে পড়ে,
ওই মেয়েটি কাছে এলে আঁচলে তার দেয় সে ভ'রে।
মাঠের হেলের 'নাস্তা' নিতে হু'কোর আগুন নিবে যে যায়
পথ ভুলে কি যায় সে ওগো, ওই মেয়েটি রান্‌ছে যেথায় ?
'নীড়ে'র ক্ষেতে বারে বারে তেষ্টাতে প্রাণ যায় যে ছাড়ি
ভর-দুপুরে আসে কেবল জল খেতে তাই ওদের বাড়ী
ফেরার পথে ভুলেই সে যে আমের আঁটির বাঁশীটিরে
ওদের ঘরের দাওয়ায় ফেলে মাঠের পানে যায় গো ফিরে।
ওই মেয়েটি বাজিয়ে তারে ফুটিয়ে তোলে গানের ব্যথা,
রাঙা মুখের চুমোয় চুমোয় বাজে সেথায় কিসের কথা !
এমনি করে দিনে দিনে লোক লোচনের আড়াল দিয়া
গেঁয়ো স্নেহের নানান ছলে পড়্‌ল বাঁধা দুইটি হিয়া।

সাঁঝের বেলা ওই মেয়েটি চল্‌ত যখন গাঙের ঘাটে
ওই ছেলেটির ঘাসের বোঝা লাগ্‌ত ভারি ওদের বাটে
মাথার বোঝা নামিয়ে ফেলে গামছা দিয়ে লইত বাতাস
ওই মেয়েটির জল ভরনে ভাস্‌ত ঢেউয়ে রূপের উছাস।
চেয়ে চেয়ে তাহার পানে বল্‌ত যেন মনে মনে
"জল ভর লো সোনার মেয়ে হবে আমার বিয়ের ক'নে ?
কলমী ফুলের নোলক দেব, হিজল ফুলের দেব মালা,
মেঠো বাঁশী বাজিয়ে তোমায় ঘুম পাড়াব, গাঁয়ের বালা,
বাঁশের কচি পাতা দিয়ে গড়িয়ে দেব নথটি নাকের
সোনালতায় গড়ব বালা তোমার দুখান সোনা হাতের।
ওই না গাঁয়ের একটি পাশে ছোট্ট বেঁধে কুটিরখানি
মেঝেয় তাহার ছড়িয়ে দেব সরষে ফুলের পাপ্‌ড়ি আনি'।
কাজলতলার হাটে গিয়ে আনব কিনে পাটের শাড়ী,
ওগো বালা, গাঁয়ের বালা, যাবে তুমি আমার বাড়ী ?"

এই রূপেতে কত কথাই আস্‌ত তাহার ছোট্ট মনে,
ওই মেয়েটি কলসী ভ'রে ফির্‌ত ঘরে ততক্ষণে।
রূপের ভার আর বইতে নারে কাঁখখানি তার এলিয়ে পড়ে
কোনোরূপে চল্‌ছে ধীরি মাটির ঘড়া জড়িয়ে ধ'রে।
রাখাল ভাবে কলসখানি না থাক্‌লে তার সরু কাঁখে
রূপের ভারেই হয়ত বালা পড়্‌ত ভেঙে পথের বাঁকে।

গাঙেরি জল ছল ছল বাহুর বাঁধন সে কি মানে
কলস ঘিরি উঠ্‌ছে দুলি' গেঁয়ো বালার রূপের টানে।
মনে মনে রাখাল ভাবে গাঁয়ের মেয়ে সোনার মেয়ে
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার এল ছেয়ে।
তুমি যদি বল আমায় এগিয়ে দিয়ে আসতে পারি
কলাপাতার আঁধার-ঘেরা ওই যে ছোট তোমার বাড়ী।
রাঙা দু'খান পা ফেলে যাও এই যে তুমি কঠিন পথে
পথের কাঁটা কত কিছু ফুট্‌তে পারে কোন মতে।
এই যে বাতাস—উতল বাতাস উড়িয়ে নিল বুকের বসন
কতখন আর রূপের লহর তোমার মাঝে রইবে গোপন।
যদিও তোমার পায়ের খাড়ু যায় বা খুলে পথের মাঝে
অমন রূপের মোহন গানে সাঁঝের আকাশ সাজবে না যে।
আহা আহা সোনার মেয়ে একা একা পথে চল,
ব্যথায় ব্যথায় আমার চোখে জল যে ঝরে ছল ছল।
এমনিতর কত কথায় সাঁঝের আকাশ হ'ত রাঙা
কখনু হলুদ আধ-হলুদ আধ-আবীর মেঘে ভাঙা।
তার পরেতে আসত আঁধার ধানের ক্ষেতে বনের বুকে
ঘাসের বোঝা মাথায় লয়ে ফিরত রাখাল ঘরের মুখে।

সেদিন রাখাল শুন্‌ল পথে সেই মেয়েটির হবে বিয়ে
আস্‌বে কালি 'নওসা' তাহার ফুল-পাগড়ি মাথায় দিয়ে।
আজকে তাহার 'হলদি-কোটা' বিয়ের গানে ভরা বাড়ী
মেয়ে-গলার করুণ গানে দেয় কে তাহার পরাণ ফাড়ি'।

সারা গায়ে হলুদ মেখে সেই মেয়েটি করছিল স্নান,
কাঁচা সোনা ঢেলে যেন রাঙিয়ে দেছে তাহার গা'খান।
চেয়ে তাহার মুখের পানে রাখাল ছেলের বুকভেঙে যায়,
আহা! আহা! হলুদ-মেয়ে কেমন করে ভুললে আমায়
সারা বাড়ী খুশীর তুফান—কেউ ভাবে না তাহার লাগি'
মুখটি তাহার সাদা যেন খুনী মোকদ্দমার দাগী।
অপরাধীর মতন সে যে পালিয়ে এসে আপন ঘরে
সারাটা রাত মর্'ল ঝুরে কি ব্যথা সে চক্ষে ধ'রে।

বিয়ের ক'নে চলছে আজি শ্বশুর-বাড়ী পালকি চ'ড়ে
চল্‌ছে সাথে গাঁয়ের মোড়ল বন্ধু ভাই-এর কাঁধটি ধ'রে।
সারাটা দিন বিয়ে বাড়ী ছিল যত কল-কোলাহল
গাঁয়ের পথে মূর্ত্তি ধ'রে তারাই যেন চল্‌ছে সকল।
কেউ বলিছে, মেয়ের বাপে খাওয়াল আজ কেমন কেমন ?
ছেলের বাপের বিত্তি বেসাৎ আছেনি ভাই তেমন তেমন ?
মেয়ে-জামাই মিলছে যেন চাঁদে চাঁদে চাঁদের মেলা
সূর্য্যি যেমন বইছে পাটে ফাগছড়ান সাঁঝের বেলা।
এমনি ক'রে কত কথাই কত জনের মনে আসে
আশ্বিনেতে যেমনিতর পানার বহর গাঙে ভাসে !
হায়রে আজি এই আনন্দ যারে লয়ে এই যে হাসি
দেখ্‌ল না কেউ সেই মেয়েটির চোখ দুটি যায় ব্যথায় ভাসি।
খুঁজল না কেউ গাঁয়ের রাখাল একলা কাঁদে কাহার লাগি।
বিজন রাতের প্রহর থাকে তাহার সাথে ব্যথায় জাগি।

সেই মেয়েটির চলা পথে সেই মেয়েটির গাঙের ঘাটে
একলা রাখাল বাজায় বাঁশী ব্যথায় ভরা গাঁয়ের বাটে।
গভীর রাতে ভাটীর সুরে বাঁশী তাহার ফেরে উদাস;
তারি সাথে কেঁপে কেঁপে কাঁদে রাতের কালো বাতাস;
করুণ করুণ—অতি করুণ বুকখানি তার উতল করে,
ফেরে বাঁশীর ডাকটি ধীরে ঘুমো গাঁয়ের ঘরে ঘরে।

"কোথায় জাগো বিরহিনী ত্যজি বিরল কুটিরখানি,
বাঁশীর ভরে এস এস ব্যথায় ব্যথায় পরাণ হানি'।
শোন শোন দশা আমার গহন রাতের গলা ধরি'
তোমার তরে, ও নিদয়া, একা একা কে'দে মরি।
এই যে জমাট রাতের আঁধার, আমার বাঁশী কাটি' তারে,
কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, কে'দে মরে বারে বারে।"

ডাকছাড়া তার কান্না শুনি একলা নিশা সইতে নারে,
আঁধার দিয়ে জড়িয়ে ধরে হাওয়ার দোলায় ব্যথার ভারে।
তাহার ব্যথা কে শুনিবে ? এই দুনিয়ায় মানুষ যত,
তাহার মত, ছেলেবেলার থাকতে পারে বুকের ক্ষত।
তাদের ব্যথার একটু পরশ যদিই বাঁশী আনতে পারে,
(তোরা) রাখালীরও উদাস সুরে গায় যেন গো 'তাইরে নারে'।

অমিয় চক্রবর্ত্তী (১৯০১—)

৫০ সংগতি

মেলাবেন তিনি ঝোড়ো হাওয়া আর
পোড়ো বাড়িটার
ঐ ভাঙা দরজাটা।
মেলাবেন।
পাগল ঝাপটে দেবে না গায়েতে কাঁটা।
আকালে আগুনে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটা
মারী-কুকুরের জিভ দিয়ে ক্ষেত চাটা,—
বন্যার জল, তবু ঝরে জল,

প্রলয় কাঁদনে ভাসে ধরাতল—
মেলাবেন।

তোমার আমার নানা সংগ্রাম,
দেশের দশের সাধনা, সুনাম,
ক্ষুধা ও ক্ষুধার যত পরিণাম
মেলাবেন।
জীবন, জীবন-মোহ,
ভাষাহারা বুকে স্বপ্নের বিদ্রোহ—
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন।
দুপুর ছায়ায় ঢাকা,
সঙ্গীহারানো পাখি উড়ায়েছে পাখা,
পাখায় কেন যে নানা রঙ তার আঁকা।
প্রাণ নেই, তবু জীবনেতে বেঁচে থাকা
—মেলাবেন।
তোমার সৃষ্টি, আমার সৃষ্টি, তাঁর সৃষ্টির মাঝে
যত কিছু সুর, যা-কিছু বেসুর বাজে
মেলাবেন।

মোটর গাড়ির চাকায় ওড়ায় ধুলো,
যারা স'রে যায় তারা শুধু— লোকগুলো;
কঠিন, কাতর, উদ্ধত, অসহায়,
যারা পায়, যারা সবই থেকে নাহি পায়,
কেন কিছু আছে বোঝানো, বোঝা না যায়—
মেলাবেন।
দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্ম্মে আছি বর্ম্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

৫১ শিল্প

তাঁতে এনে বসালেম বুক থেকে রোদ্দুরের সুতো,
নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উৎসবে ঃ
তোমার পায়ের প্রান্তে লুটোবে যখন যাবে দ্রুত
প্রাণের বসন্ত দিনে কত কী উৎসবে।
কত ফুলো কত রঙ কত মায়া, কত কল্পনায়
তোমারে সে বেনারসী বোনা হয় ;
তুমি তো জানো না,
প'রে শুধু আশ্চর্যের লগ্নে তুমি হও অন্যমনা।

যা দিয়েছিলাম সে তো প্রাণরক্ত, অন্য সে রক্তিমে;
আঁচল সোনালি গাঢ় আমারি প্রেমের মুগ্ধ হিমে;
সঙ্গে কত স্পর্শভরা জড়ায় অস্পর্শ আলিম্পন
সাত-পাকে ঘোরো যবে তোমার জীবনে শুভক্ষণ;
মর্ত্যে এসে মাঙ্গলিক রেখে যাই,
অনামী শিল্পের গায়ে বাসনার খেয়াল মেশাই;
তাঁতির আঙুল জানে কত সুতো গেঁথে গেঁথে শেষে
প্রাণে প্রাণে কত দানে তোমার অর্ঘ্যের দান মেশে ॥

৫২ মাটি

ধান করো, ধান হবে, ধুলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি
ব'সে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে স'রে স'রে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এই মতো।

তাইতে আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্য্যের জীবনীর দাবি।
কচি বুকেতে গন্ধে অন্ন ধান
সোনামাঠে ছেয়ে দেবে শ্রমের সম্মান।
তারি জন্য সূর্য্য তাপী, বাহুর শক্তির অধিকার,
মানুষের জন্ম নিয়ে প্রাণের সংকল্প বাঁচাবার।
বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।
তারি জন্য শিশু আঙিনায়
দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।
গাছ চাই, গাছ হবে, ছায়া দেবে, বাড়িতে বাগানে
শহরে শিল্পের সৌধে প্রাণ জাগে প্রাণে।
যা হয় তারই সে হওয়া আরোই উজ্জ্বল ক'রে তুলি
কঠিন লাবণ্যে ছুঁই মনের অঙ্গুলি।
বীজ আনি, জল আনি, ভাগ্যজয়ী খেলা তারো বেশি—
যে-রহস্য সর্ব্বাতীত তারি সঙ্গে হোক রেশারেশি
অচিন্ত্য রহস্য খুলে যাই—
কিছু হয়, হয় না বা, এরি মাটি চষি এসো ভাই

৫৩ ডায়েরি

আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধে ছুঁয়ে তার ঐ ভুবন ভ'রে থাকুক,
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক ॥
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাইনে দুঃখ নিতে।

কে জানে প্রশ্ন আনন্দ কেন ওর পরিচয় কিছু,
গাছের তলায় হাওয়ার জোরে কোথায় চলে নীচু—
আহা পিঁপড়ে ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দুর্দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে ॥

৫৪ ডায়েরী

আমি যেন বলি, আর তুমি যেন শোনো
জীবনে জীবনে তার শেষ নেই কোনো।
দিনের কাহিনী কত, রাত চন্দ্রাবলী
মেঘ হয়, আলো হয়, কথা যাই বলি।
ঘাস ফোটে, ধান ওঠে, তারা জ্বলে রাতে,
গ্রাম থেকে পাড়ি ভাঙে নদীর আঘাতে।
দুঃখের আবর্ত্তে নৌকো ডোবে, ঝড় নামে,
নূতন প্রাণের বার্ত্তা জাগে গ্রামে গ্রামে—
নীলান্ত আকাশে শেষ পাইনি কখনো
আমি যেন বলি, আর, তুমি যেন শোনো।
তুমি যেন বলো, আর আমি যেন শুনি
প্রহরে যায় কল্পজাল বুনি।
কুমুদকহ্লার ভাসে থৈ থৈ জলে
কোথা মাঠ ফেটে যায় মারীর অনলে।
আঙিনায় শিশু খেলে, ফুসে ধরে মৌ,
তুলসীতলায় দীপ জ্বালে মেজো বৌ
সানাই বাজানো রাতে হঠাৎ জনতা
বিয়ে ভেঙে মালা ছিঁড়ে ছড়ায় মত্ততা।
মানুষের প্রাণে তবু নিরন্ত ফাল্গুনী—
তুমি যেন বলো আর আমি যেন শুনি ॥

৫৫ বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে ॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে,
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে,
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।
ধানের ক্ষেতের কাঁচা মাটি, গ্রামের বুকের কাঁচা বাটে,
বৃষ্টি পড়ে মধ্যদিনে অবিরল বর্ষাধারাজলে ॥

বাই ভিজে ঘাসে ঘাসে বাগানের নিবিড় পল্লবে
স্তম্ভিত দিঘির জলে, স্তরে স্তরে, আকাশে মাটিতে ॥

অন্ধকার বর্ষাদিনে বৃষ্টি ঝরে জলের নির্ঝরে
গতির অসংখ্য বেগে, অবিশ্রান্ত জাগ্রত সঞ্চারে, স্বপ্নবেগে
সঞ্চলিত মেঘে, মাঠে, কম্পিত মাটির অনুপ্রাণে।
গেরুয়া পাথরে জল পড়ে, অরণ্য তরঙ্গশীর্ষে, মাঠে
ফিরে নামে মর্ম্মজল সমুদ্রে মাটিতে।
বৃষ্টি ঝরে ॥
মেঘে মাঠে শুভক্ষণে ঐক্যধারে
বিদ্যুতে
আগুনে
ঘূর্ণাঝড়ে
সৃজনের অন্ধকারে বৃষ্টি নামে বর্ষাজলধারে ॥

রচিত বৃষ্টির পারে, রৌদ্র, মাটি রুদ্র দিন, দূরে,
উদাসীন মাঠে মাঠে আকাশেতে লগ্নহীন সুরে।

৫৬ বড়ো বাবুর কাছে নিবেদন

তালিকা প্রস্তুত :
কী কী কেড়ে নিতে পারবে না—
হই না নিব্বাসিত কেরাণী।
বাস্তুভিটে পৃথিবীটার সাধারণ অস্তিত্ব।
যার এক খণ্ড এই ক্ষুদ্র চাকুরের আমিত্ব।
যতদিন বাঁচি, ভোরের আকাশে চোখ জাগানো,
হাওয়া উঠ্‌লে হাওয়া মুখে লাগানো।
কুয়োর ঠাণ্ডা জল, গানের কান, বইয়ের দৃষ্টি
গ্রীষ্মের দুপুরে বৃষ্টি।
আপন জনকে ভালোবাসা,
বাঙ্‌লার স্মৃতিদীর্ণ বাড়ি-ফেরার আশা।

তাড়াও সংসার, রাখ্‌লাম
বুকে ঢাক্‌লাম
জন্মজন্মান্তরের তৃপ্তি যার যোগ প্রাচীন গাছের ছায়ায়
তুলসী-মণ্ডপে, নদীর পোড়ো দেউলে, আপন ভাষার কণ্ঠের মায়ায়।
থর্ডক্লাশের ট্রেণে যেতে জান্‌লায় চাওয়া,
ধানের মাড়াই, কলা গাছ, পুকুর, খিড়কি-পথ ঘাসে ছাওয়া।
মেঘ করেছে, দুপাশে ডোবা, সবুজ পানায় ডোবা,
সুন্দরফুল কচুরিপানার শঙ্কিত শোভা,
গঙ্গার ভরা জল ; ছোটো নদী; গাঁয়ের নিমছায়াতীর
—হায়, এও তো ফেরা-ট্রেণের কথা।

শত শতাব্দীর
তরু বনশ্রী
নির্জ্জন মনশ্রী :

তোমায় শোনাই, উপস্থিত ফর্দ্দে আরো আছে—
দূর-সংসারে এল কাছে
বাঁচবার সার্থকতা ॥

৫৭ বাড়ি

সিঁড়ি দিয়ে শুতে আসি ছাতে
ঘোরানো অনেক ধাপ সিঁড়ি,
ছাতে বহু তারা।
নীচের তলায় বন্ধ তালা
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
সিঁড়ি ছায়া-ভরা, বহু সিঁড়ি
উঠে আসি কাজ ক'রে সারা ॥
আমার বাড়িতে হোলো বাস
নয় পুরো বারো মাস;
ঘরকে সাজাই, কাজে থাকি,
দিনে মগ্ন রয় আঁখি,
ওঠা-নামা ঘোরানো সিঁড়িতে।
সূর্য্য অস্তে জানালার শাসি
রঙে যায় ভাসি'
রাত্রি নামে।
পর্দ্দা টেনে বসি বই নিয়ে
সহসা চমক ভেঙে দিয়ে
ঘণ্টা বাজে,
শব্দ তার থামে॥
ছায়া-ভরা সিঁড়ি, মধ্য রাতে
ধীরে ধীরে উঠে আসি ছাতে,
বেয়ে চলি সিঁড়ির ইসারা—
নীচের তলায় বন্ধ তালা
দোতলায় আলো আছে জ্বালা,
ছাতে বহু তারা।

৫৮ আয়না

হারানো ছড়ানো পাগল খুঁজচে
ফিরে সে আপন হবে।
আলোর টুক্‌রো দীপ্তি চোখের ;
ভাঙা-গান-ভাসা বাঁশির কানকে ;
সেই নাক, যার সুরভি বোধটা
চামেলি বকুলে গেল কোথায় ;
—ফিরে ফিরে চায় তাই।
হায় হায় তার চেতনা-জড়ানো
কত দিনরাত পিছে ডাকে কেঁদে কেঁদে।
হারানো ছড়ানো পাগল।

জানে তার হাড় ধুলোয় উড়বে,
কিছুই দেহের থাক্‌বে না প্রাণকণা ;
আরো আরো বুক সবই খ'সে ঝ'রে
মিশে যায় মেঘে হাওয়ায় জলে।
নিভে যাবে মন আরো।
এখনই কোথায় লক্ষ খনের ছবি ?
হাজার দুপুর, বেগুনি সন্ধ্যা, ভোরে নীল হাওয়া, তামসীর চাঁদ
খেয়ালী খেলায় পাল তুলে গেছে পার।
ফিরিয়ে তবুও রাখ্‌বে, বাঁধ্‌বে, ঢাক্‌বে,
সাধ্‌বে—ভাব্‌চে পাগল।
হারানো ছড়ানো পাগল।

হারানো ছড়ানো পাগল একলা
দাঁড়ালো মাঠের ধারে—
দূরে বুড়ো বট ঝিমন্ত-জাগা,
ঝাঁ ঝাঁ রোদ-লাগা, সবুজ ছন্দে স্থির।
একটু হাওয়ার মন্ত্র।

দেখচে পাগল প্রকাণ্ড চাকা
নীল আঁকা বাঁকা দিগন্তের ;
প্রখর মন্ত্রে শুনচে ঝিল্লি বাজনো।
উঁচু সূর্য্যের ওপারে শূন্য, সোনায় সাজানো ;
চেনা গ্রাম ঐ ঘোর অচেনার
বিপুল আবেগ আনন্দে।
ঝনঝন ক'রে সৃষ্টি সন্ধ ভাঙচে, গড়চে, চলচে—
কোথায় তুমুল শব্দ ?
মাঝখানে তারি হঠাৎ পাগল মুখ দেখে চেনে আয়নায়
আকাশে তাকিয়ে হাসে।
ভরা সন্ধ্যায় চুপ ক'রে বসে থাকে
হারানো জড়ানো পাগল ॥

৫৯ রাত্রি যাপন

বুকে প্রাণটা এম্‌নিই রইল, জানো ভাই,
ঘরে দাঁড়িয়ে মন বল্‌লে শুধু, যাই
—যাই।
প্রকাণ্ড তামার চাঁদ রাত্রে
গলে হল সোনা। সোনার পাত্রে
পরে আভায় ছড়াল অন্তর্লীন রোদ্দুর।
নৌকো দূরে গেল বেয়ে সেই নীল অভ্রের সমুদ্দুর।
সেদিন রাত্রে যখন আমার কুমু বোনকে হারাই।

আর, অজ্ঞান মুহূর্ত্তগুলো, তারায়
মিলিয়ে রইল স্বচ্ছধারায়।

জেগে-থাকা চোখে,
মাটিগাছমাঠের জমা-ঠাণ্ডা দৃশ্য পলকে পলকে
বদ্‌লালো একটু বর্ণ ; তবু বর্ণহীন
একটু আলো ছিল, ক্ষীণ, খুব ক্ষীণ।
আলোর সূক্ষ্ম প্রাণ অণুতে অণুতে কী হচ্ছিল। কালোর মধ্যে দিয়ে উদয়।
অন্য কিছু নয়।

তিরোহিত চন্দ্রবর্ণ আকাশে উষা।
এল আবার দিন, প্রাচীন সোনার বেশভূষা।
ঘরের দেয়ালগুলো ফুটলো রাঙা আঁচড়ে।
তার পর ? মেঘের স্তরে স্তরে
রোজকার বিষণ্ণ সুন্দর সকাল এল ভ'রে।

তখন দরজায় দেখ্‌লেম দাঁড়িয়ে—হঠাৎ—আছি সবাই,
জানো ভাই,
—আর সবাই।

বুকের হাড়ে শক্ত কান্না নেই, কেবল, কী জানি
হয়তো এম্‌নিই মনে-করা,
যাই. একবার যাই। রইলামই তবু। শক্ত ধরা ॥

৬০ বৃষ্টি

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।
ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটার পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;

আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।
নিবিষ্ট ক্লান্তির স্বর ঝরঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আঁভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টীপ,
নিভে যায় চোখে;
দুলায়ে নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া।
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।
আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্তদিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরহ,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি, গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে !

৬১ চেতন স্যাকরা

সোনা বানাই। সাঁকোর বাঁ পাশে গয়না
কাচের বাক্সে, জানলায় দ্রষ্টব্য; জান্‌লার উপর ময়না
রেগে ওঠে তোমাদের ভিড়ে—ছোলা খাও, বলো "রাধে
রাধে" "কেষ্ট কেষ্ট"—বল্‌তে বাধে

গলিতে, তোমাদের অতীব নোংরা গলিতে,
সোনার সুন্দর, রূপোর রূপকার, এই নর্দমার দোকান দেহলিতে
ধ্যান বানাই। এই আমার উত্তর।
ড্রেন, ধুলো, মাছি, মশা, ঘেয়ো কুত্তোর

আড়ৎ বেঁধে আছ, বাঁচো (কিমাশ্চর্য্য বাঁচা) এবং যমের কৃপায়, মরা;
অমৃতস্য অধম পুত্র, বন্দী স্যাঁৎসেঁতে গলির ঘরে ইঁদুর-ভরা;
নেই রাগ।—অবশ্য। আছ আনন্দে। খাও ভেজাল ঘিয়ের জিলিপি,
শিশু কাঁদায়, ধোঁয়ার সংসার, খুলে ওষুধের ছিপি
মা-বোনকে খাওয়াও—দয়ার ডাক্তার অন্তিম লাগ্‌লে,
তৎপূর্ব্বাবধি রান্নার পাকে কসে ঘোরাও; নিজে ভাগ্‌লে,
শক্ত সিনেমার সীটে, ইতর প্রাণের গিল্‌টি
মুখ-ভরা পান, দৃশ্য হলিউড্‌, মোক্ষের পিল্‌টি
ভোলায় ধিক্কার, সন্ধেটা কাটে; তবু রাত্রে জেগে ভাবো ভাবোই
কিছু একটা হয়তো হবে, বুঝি বা কোথাও যাবো, যাবোই—
কোথাও যাবে না, গলিতেই থাক্‌বে। বড়ো রাস্তায় যাদের বাসা
হাঁ ক'রে দেখ্‌বে তাদের মোটর, পনেরোটা বেড়াল, সখের চাকর—
থাকবে খাসা,

কেউ ছোঁবে না তাদের ঘোড়-দৌড়, মদ-পাশা; দরোয়ানের লাঠি
বাঁচাবে তাদের লুঠ-ভরা সিন্ধুক; একটু ঈর্ষা করবে, দীর্ঘশ্বাস
তবু তাদের চাটবে মাটি,
চাক্‌রির রাস্তায়। তোমরা ধার্ম্মিক, কৃষ্ণের জীব, বিদ্রোহ করো না,
অদৃষ্ট মানো,

পূর্বজন্মের পথ পাও গলিতেই : আহা গদ্‌গদ্‌ মাদুলি,
তাগা মূর্ত্তি যুকে টানো ;
গুরুর দর্শন, কর্ত্তার বাক্য, দলীয় ভক্তির অদ্ভুৎ দৈবে
মর্‌লে যাও স্বর্গে—জীবনকে বানাও নরক—বিশুদ্ধ আর্য্যামি সইবে
বিদেশীর শাসন ; যতক্ষণ আছে জাত, অধিকারী-তন্ত্ব, ম্লেচ্ছকে ঘৃণা
ভয় কি দেশের ? বাহিরের পরাজয় হবেই তো, (ভিতরে জীবন্মৃত)
ভাল তাল সোনা, উত্তম উত্তর ; ছুঁড়ে তো মারা যায় না ? কলিযুগ কিনা।
গলিতে গলিতে মেশাই রোদ্দুরে, দাঁড়ের ময়নাকে দিই বায়না
গান শোনায় বনের ; চোখে আছে, আমার চাল্‌সের চোখেও, গাঁয়ে
গঙ্গায় উপর
শুভ্র ধাপ, তেঁতুলগাছের ঝিল্‌মিল্‌, প্রাণের ছাঁদ মেলাই রূপোর
চন্দ্রহারে, দোলাই কানের দুলে, আমার উত্তর মণিতে বাঁধি ;
জেলে দিতে পারিনে গলিকে (এবং তোমাদের), নই নৈতিক পল্টন,
সভায় বক্তা ইত্যাদি।
শুধু জানি আগুন, আগুনের কাজ, সৃষ্টির আগুন, লাগ্‌লে প্রাণে
তীব্র হানে বেদনা জাগ্‌বার, আর্টের আগুন, মরীয়াকে টানে।
গর্ব্বিত আধবুড়োর উদ্ধত এই গয়না !
ভিড়ে কাচ ভেঙো না ;—বুলি, বুলি, রাম রাম, বলো ময়না
বলো ফার্সি, আর্‌বি, ধার্ম্মিক গজল—ফিরে গলির গর্ত্তে
সোনার মার নাও সঙ্গে—পারো তো কিছু কিনো—থাক্‌, চাইনে
খদ্দের ধর্‌তে ॥

৬২ মেঘদূত

(১)

(শিল্পলোক)

শাপগ্রস্ত সেদিনের মেঘঝড়
হোলো আজ কালির আঁচড়,
বর্ণধূলি।
হে যক্ষ,
তোমারও সে-গতি ; লুপ্ত-মেঘে
অঙ্গুলি-
কম্পিত রেখার সূক্ষ্ম তুলি-
লগ্ন হলে চিত্রীর উদ্বেগে।
তব সখ্য
ছাপার অক্ষর,
কালিদাস।

সে ছবি
সংস্কৃত কাব্য,
—ছাত্রের, প্রিয়ার নয়—হোলো ইতিহাস,—
খোঁজে ভগ্নশেষ
উজ্জয়িনী চূড়ার উদ্দেশ ॥

(২)

(পৃথিবী ও প্রাণলোক)

বৃষ্টি পড়ে,
ছাতাঅলা গলির ভিতরে।
গঙ্গা,
বেত্রবতী নদী নয় শিপ্রা নয়, তবু তার সংজ্ঞা
সেই জলে, সেই মেঘে হাওয়ার প্রবাহে।
(আজিকে কাহারে চাহে ?)

হাওড়ায় পুলে
লক্ষ লক্ষ,
হে যক্ষ,
মনোরথে নয়, বাস-এ, মোটরে ইত্যাদি
অনাদি
তোমাদেরই বহি এই ধারা।
এ জীবন আজো মিল-হারা
দেখো অদ্ভুত
চলে মর্ত্ত্যে দুই মেঘদূত।

(৩)

(ব্যক্তিবিশেষ ও সংঘটনের পরিণাম)

এই দুই ধারা পারে
যক্ষ,
কোথা নিজে তুমি ?
সে কোথায় ?
রচিবারে
পারে কোন্ সৃষ্টি-কবি মেঘকায়া,
জলের হাওয়ার ছায়া
সেদিনের ? সেই ভূমি,
জম্বুবন, বিরহ-জ্যোতির শূন্য উঠিবে কুসুমি ?
আবার প্রাণের নাট্যে নব রামগিরি-
আশ্রমের মূর্ত্তি ঘিরি'
শাপমুক্ত কোনো সৃষ্টি ঝরে
তিন মেঘদূত এক হবে,
আপনা-সম্পূর্ণ লিখা
মিলনের যুক্ত-শিখা ?
কবে
কালির আঁচড়ে,

বর্ণধূলি-
লগ্ন কোন্ চিত্রীর অঙ্গুলি
ঘূর্ণাবেগে,
জেগে-
ওঠা বাদলের কণ্ঠস্বরে ?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১—)

৬৩ নাম

চাই, চাই, আজো চাই তোমারে কেবলি।
আজো বলি,
জনশূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি আজো বলি—
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার,
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিরাশ অসীমে আজো নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন কক্ষে মোরে বন্দী ক'রে রেখেছে প্রেয়সী;
গতি-অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতীতের প্রতিভাস জ্যোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ ॥
তবু মোর মন
মোহপরে করেনি আশ্রয়।
জানি, তুমি মরীচিকা; তোমাসনে প্রাণ-বিনিময়
কোনোদিন হবে না আমার।
আমার পাতালমুখী বসুধার ভার,
জানি, কেহ পারিবে না ভাগ ক'রে নিতে;

আমারে নিষ্পিষ্ট করি মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে
এক দিন স্বরচিত এ-পৃথিবী মম ॥

জানি, ব্যর্থ, ব্যর্থ সেই সন্ধ্যা নিরুপম
যবে মোর আননে নেহারি
অগাধ নয়নে তব ফলদা স্বাতীর পুণ্য বারি
হয়েছিলো সহসা উচ্ছল।
জানি, সেই বনপথে করেছিনু আপনারে ছল;
চিরাভ্যস্ত প্রেমনিবেদনে
পশিনি তোমার মর্ম্মে, আপনার চিত্তের গহনে
শুধু পুঞ্জ করেছিনু মিথ্যার জঞ্জাল।
জানি, কত তরুণীর গাল
অমনি অধৈর্য্যভরে শত বার দিয়েছি রাঙায়ে ;
অনুপূর্ব্ব পথিকার পায়ে
বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত
ক্ষণিক পুষ্পের লোভে। জানি, প্রথামত
তাহাদের পদরেখা মুছে গেছে রৌদ্রে জলে ঝড়ে।
জানি, যুগান্তরে
তোমারো দুর্ব্বহ স্মৃতি লুপ্ত হবে পথের ধূলায় ॥

তবু চায়, প্রাণ মোর তোমারেই চায়।
তবু আজ প্রেতপূর্ণ ঘরে
অদম্য উদ্বেগ মোর অব্যক্তের অমর্য্যাদা করে;
অনন্ত ক্ষতির সংজ্ঞা জপে তব পরাক্রান্ত নাম—
নাম—শুধু নাম—শুধু নাম ॥

৬৪ উটপাখী

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধু ধু করে মরুভূমি;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা ॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবে না ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবে না আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও;
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদপ্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতিগে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে ॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলব না লোহার চিড়িয়াখানা;
ডেকে আনব না হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।

ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাব তাতে;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজব না অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাব না ঝুমঝুমি,
নির্বোধ লোভে যাবে না ভাবনা মিশে;
সে-পাড়াজুড়ানো বুলবুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে ঊনতিরিশে ॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

৬৫ নরক

অন্ধকারে নাহি মিলে দিশা ॥

দীর্ঘায়িত নিশা
বয়স্ফীত বারাঙ্গনা-পারা
দুর্গম তীর্থের পথে হয়ে সঙ্গীহারা

ঘুমায়ে পড়েছে যেন আতিথেয় অজানার পাশে
দুর্মর অভ্যাসে।
কেশকীটে ভরা তার মাথা
লুটায় আমার কাঁধে, পরণের শতচ্ছিদ্র কাঁথা
বিষায় জীবনবায়ু সংকীর্ণ কুটীরে,
তাহার বিক্ষিপ্ত বাহু ধরিয়াছে মোর কণ্ঠ ঘিরে,
ক্ষণে ক্ষণে
অজ্ঞাত দুঃস্বপ্ন তার সন্ত্রস্ত কম্পনে
সঞ্চারিত হয় মোর জাতিস্মর অবচেতনায় ॥

অতন্দ্রিত চক্ষু কিছু দেখিতে না পায়;
শুধু মোর সংকুচিত কায়া
অনুভব করে যেন নামহীন কাহাদের ছায়া
শিয়রে সংহত হয়ে উঠে ;—
কোন্ যাদুঘর হতে দলে দলে পাশে এসে জুটে
অবলুপ্ত পশুদের ভূত
কুৎসিত, অদ্ভুত।
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা হানি, নিরাকার লজ্জা অসন্তোষ,
অসিদ্ধ দুরাশা দম্ভ, নিষ্ফল আক্রোশ
কানাকানি করে অন্তরালে।
রন্ধ্রহীন বিস্মৃতির প্রতন পাতালে
অতিক্রান্ত বিলাসের, অস্থাবর প্রমোদের শব
অনুর্বর সাম্প্রতেরে করিবারে চায় পরাভব
যোগায়ে জীয়ানরস অপুষ্পক বীজে ॥

অয়ি মনসিজে,
কোথা তুমি কোথা আজ এই স্থূল শরীরী নিশীথে ?
তোমার অতল, কালো, অতনু আঁখিতে
তারকার হিম দীপ্তি ভ'রে
তাকাও আমার মুখে। অনাত্মীয় অসিত অম্বরে

এলাও অস্পৃশ্য কেশ সুক্ষ্ম, নিরুপম,
স্বপ্নস্বচ্ছ বরাভয়ে আত্মত্যাগী বেরেনিকে-সম।
হেমন্ত হাওয়ার নিমন্ত্রণে
অনঙ্গ আত্মারে মোর ডাক দাও নীহার শয়নে
দুস্তর নাস্তির পরপারে ;
দাঁড়ায়ে যে-নির্বাণের নির্লিপ্ত কিনারে
নিরুদ্বেগ নচিকেতা দেখেছিল অধোমুখে চাহি
সম্ভোগরাত্রির শেষে ফেনিল সাগরে অবগাহি
কষিতকাঞ্চনকান্তি নগ্ন বসুন্ধরা
তারই প্রলোভনতরে সাজায়িছে যৌবনপসরা
রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে, কামাতুর রামার সমান,
হে বৈদেহী, করো মোরে সেখানে আহ্বান ॥

পন্ডশ্রম, নাহি মিলে সাড়া ;
শূন্যতার কারা
অগোচর অবরোধে ঘিরে মোর আর্ত মিনতিরে ;
যতই পলাতে চাই অভেদ্য তিমিরে
মাথা ঠুকে রক্তপঙ্কে পড়ি,
অগ্রজের মৃতদেহ যায় গড়াগড়ি
ক্রিমিভোগ্য দুর্গন্ধে যেখানে,
চরে যেথা ক্ষয়স্তূপে ভোজ্যের সন্ধানে
ক্লেদপুষ্ট সরীসৃপ, স্বেদস্রাবী বক্র বিষধর,
পঙ্কিল মণ্ডূক আর মূষিক তস্কর,
বজ্রনখ পেচক, বাদুড় ॥

বমনবিধুর
আমার অনাত্ম্য দেহ প'ড়ে আছে মৃন্ময় নরকে।
মৌন নিরালোকে
ভুঞ্জে তারে খুশিমতো গৃধ্নু নিশাচর।
দুস্তর, দুস্তর, জানি, শাস্তি মোর দুঃসহ, দুস্তর।

মনে হয় তাই
আত্মরক্ষা হাস্যকর, সুসংকল্প মৌখিক বড়াই,
জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।
মানসীর দিব্য আবির্ভাব,
সে শুধু সম্ভব স্বপ্নে, জাগরণে আমরা একাকী ;
তাহার বিখ্যাত রাখী,
সে নহে মঙ্গলসূত্র, কেবল কুটিল নাগপাশ;
মলময় তাহার উচ্ছ্বাস
বোনে শুধু ঊর্ণাজাল অসতর্ক মক্ষিকার পথে ॥

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।
যন্ত্রণাই
জীবনে একান্ত সত্য, তারই নিরুদ্দেশে
আমাদের প্রাণযাত্রা সাঙ্গ হয় প্রত্যেক নিমেষে ॥

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমনকি বিভীষিকা তুমি ॥

৬৬ প্রার্থনা

হে বিধাতা,
অতিক্রান্ত শতাব্দীর পৈতৃক বিধাতা,
দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস।
যেন পূর্বপুরুষের মতো
আমিও নিশ্চিন্তে ভাবি ক্রীত, পদানত,
তুমি মোর আজ্ঞাবাহী দাস।
তাদের সমান
মণ্ডূকের কূপে মোরে চিরতরে রাখো, ভগবান।
কমঠবৃত্তির অহঙ্কারে
ঢাকো ক্ষণভঙ্গুরতা। তাদের দৃষ্টান্ত-অনুসারে
আমিও ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করি।
মর্যাদার ছিদ্রিত গাগরি
জোড়ে যেন বারংবার ডুবে, আত্মপ্রসাদের স্রোতে।
রৌদ্র জ্যোতি হতে
আবার ফিরাও মোরে তমসার প্রত্ন দায়ভাগে।
ঘুণধরা হাড়ে যেন লাগে
উঞ্ছপুষ্ট জ্যেষ্ঠদের তৈলসিক্ত মেদ;
মরে যেন উদ্বন্ধনে অপজাত হৃদয়ের খেদ ॥

পিতৃপিতামহদের প্রায়
তোমার নামের গুণে তীর্ণ হয়ে দশম দশায়
মূঢ়, মূক গড্ডলেরে দিই যেন বলি
রক্তপিপাসিত যূপে।
বাচাল বিদ্রূপে
হুঙ্কারিলে দুর্বৃত্তের উদ্ধত দম্ভোলি,
গুরুজনদের মতো করি যেন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
শক্তির উচ্চল পায়ে; আর্তির সংক্রাম
কেটে গেলে কালক্রমে জনাকীর্ণ রাজপথ থেকে,
স্ফীত বুকে অপ্রতিষ্ঠ পৌরুষেরে ঝেড়ে,

হাসিমুখে হাত নেড়ে
পলাতক সধর্মীরে ডেকে,
প্রমাণিতে পারি যেন সবই তব ইচ্ছা, ইচ্ছাময় ॥

এলে পরে লাভের সময়,
সদসৎনির্বিচারে, সকলই তোমার দান ব'লে,
নিঃস্বের স্বেদাক্ত কড়ি হাতায়ে কৌশলে
আমিও জমাই যেন যক্ষসংরক্ষিত কোষাগারে।
শ্রুতিধর মান্ধাতার উক্তির উদ্ধারে
লুকায়ে ইন্দ্রিয়াসক্তি ; অবিমৃষ্য জন্মের জঞ্জালে
বিষায়ে সংকীর্ণ সৌধ ; জলে, স্থলে, নভে
বিরোধের বীজ বুনে ; নিরন্তর নিষ্কাম প্রসবে
ভগ্নস্বাস্থ্য গর্ভিণীর ক্লিন্ন অন্তকালে,
তোমার প্রতিভূ সেজে, উন্নরক স্বর্গের আশ্বাসে
সাধ্বীর সদ্‌গতি যেন করি।
ঊর্ধ্বশ্বাস উৎসবের উদ্বায়ী উচ্ছ্বাসে
তোমারে পাশরি,
দারুণ দুর্দিনে যেন পূজা মেনে বিস্ময়ে শুধাই,
"স্মরণে কি নাই,
"দয়াময়, আশ্রিতেরে স্মরণে কি নাই ?"

ভগবান, ভগবান,
অতীতের অলীক, আত্মীয় ভগবান,
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ।
শকুনির ক্ষুধানিবারণে
শস্যশ্যাম কুরুক্ষেত্রে মায়াবাদ ভ'নে,
সূচ্যগ্রমেদিনীলোভী যুযুৎসুরে ক্ষমিতে শেখাও
অপরের অপঘাত। তুলে নাও,
আমার রথাশ্বরজ্জু, হে সারথি, তুলে নাও হাতে।

স্বার্থের সংঘাতে
বিতর্ক, বিচার হানো। মর্মে মর্মে, মজ্জায় মজ্জায়
জাগাও অন্যায়, শাঠ্য। হিংস্র অলজ্জায়
পুণ্যশ্লোক সগোত্রের তুল্য মূল্য দাও দাও মোরে।
অপ্রকট সততার জোরে
আমার অন্তিম যাত্রা, অতিক্রমি সুমেরুর বাধা,
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
যেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরুমূলে ॥

কিন্তু যেথা সর্পিল নিষেধ
স্বপুচ্ছের উপজীব্যে সাধে আত্মবেদ
প্রমিতির বিষবৃক্ষে, অমিতির অচিন্ত্য অভাবে ;
অন্তরঙ্গ জনতার নিবিড় সদ্ভাবে
হয়নি বাসোপযোগী অদ্যাবধি যে-নিস্তাপ মরু ;
পশুপতি বাজায়ে ডমরু
মোর গোষ্ঠীপতিদের নাচায়নি যার ত্রিসীমায় ;
নিরালম্ব নিরালোকে যেথা
দেব-দ্বিজ-প্রবঞ্চিত ত্রিশঙ্কু ঝিমায়,
মৌনের মন্ত্রণা শোনে মৃত্যুবিপ্রলব্ধ নচিকেতা ;
সেখানে আমার তরে বিছায়ো না অনন্ত শয়ান,
হে ঈশান,
লুপ্তবংশ কুলীনের কল্পিত ঈশান ॥

৬৭ শাশ্বতী

শ্রান্ত বরষা অবেলার অবসরে
প্রাঙ্গণে এলে দিয়েছে শ্যামল কায়া ;
স্বর্ণ সুযোগে লুকাচুরি-খেলা করে
গগনে গগনে পলাতক আলো-ছায়া।

আগত শরৎ অগোচর প্রতিবেশে ;
হানে মৃদঙ্গ বাতাসে প্রতিধ্বনি :
মূক প্রতীক্ষা সমাপ্ত অবশেষে,
মাঠে, ঘাটে, বাটে আরব্ধ আগমনী।
কুহেলীকলুষ দীর্ঘ দিনের সীমা
এখনই হারাবে কৌমুদীজাগরে যে ;
বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা
রঞ্জিত হবে দলিত শেফালীশেজে।
মিলনোৎসবে সেও তো পড়েনি বাকি,
নবান্নে তার আসন রয়েছে পাতা ঃ
পশ্চাতে চায় আমারই উদাস আঁখি;
একবেণী হিয়া ছাড়ে না মলিন কাঁথা ।।

একদা এমনই বাদলশেষের রাতে—
মনে হয় যেন শত জনমের আগে—
সে এসে সহসা হাত রেখেছিল হাতে,
চেয়েছিল মুখে সহজিয়া অনুরাগে;
সে-দিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী ;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে',
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি ;
একটি পণের অমিত প্রগল্‌ভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে ;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিল অবারিত ক'রে ॥

সন্ধিলগ্ন ফিরেছে সে-গৌরবে :
অধরা আবার ডাকে সুধাসঙ্কেতে ;
মদমুকুলিত তারই দেহসৌরভে
অনামা কুসুম অজানায় ওঠে মেতে।
ভরা নদী তার আবেগের প্রতিনিধি,
অবাধ সাগরে উধাও অগাধ থেকে;
অমল আকাশে মুকুরিত তার হৃদি;
দিব্য শিশিরে তারই স্বেদ অভিষেকে।
স্বপ্নালু নিশা নীল তার আঁখিসম ;
সে-রোমরাজির কোমলতা ঘাসে ঘাসে ;
পুনরাবৃত্ত রসনায়—'প্রিয়তম' ;
আজ সে কেবল আর কারে ভালোবাসে।
স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
অমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
সে ভুলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না ॥

৬৮ সমাপ্তি

বরষাবিষণ্ণ বেলা কাটালাম উন্মন আবেশে।
জনশূন্য হৃদয়ের কবাট উদ্‌ঘাটি,
স্মরণের চলাচল করিলাম সহজ, সরল।
দৃষ্টিহারা নেত্রপাতে দেখিলাম সন্নত আকাশে
এইমতো আর এক দিবসের ছবি।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টির বিলাপে
শুনিলাম সে-কণ্ঠের স্নেহসম্ভাষণ।
অর্গলিত বাতায়নে ঝটিকার নিরর্থ আক্রোশে
বিচ্ছেদবিধ্বস্ত হিয়া বাখানিল ক্ষুব্ধ অক্ষমতা
নির্বিকার, নিরুত্তর, রুক্ষ বিধাতারে ॥

এল সন্ধ্যা রিক্তবরিষণ ;
দিনান্তের মুমূর্ষু বর্ত্তিকা
প্রাক্‌নির্বাপণ দীপ্তি প্রজ্জ্বলিত করিল সহসা
প্রাণের অন্তিম শক্তিব্যয়ে ;
তার পর অন্তরে বাহিরে
অন্ধকার বিস্তারিল শবপ্রাবরণী ॥

মনে হলো আশা নাই,
মনে হলো ভাষা নাই পিঞ্জরিত ব্যর্থতা বলার।
মনে হলো
সঙ্কুচিত হয়ে আসে মরণের চক্রব্যূহ যেন।
মনে হলো রন্ধ্রচারী মূষিকের মতো
শটিত জঞ্জালকণা কুড়ায়েছি এত কাল ধ'রে
কৃপণের ভাণ্ডারে ভাণ্ডারে ;
এই বার ফুরায়েছে পালা,
ঘাতক যন্ত্রের কারা অবরুদ্ধ হলো অবশেষে ;
এই বার উত্তোলিত সম্মার্জ্জনীমূলে
পিষ্ট হবে অচিরাৎ অকিঞ্চন উঞ্ছবৃত্তি মম ॥

৬৯ সংবর্ত

এখনও বৃষ্টির দিনে মনে পড়ে তাকে।
প্রাদেশিক শ্যামলিমা যেই পাংশু সাধারণ্যে ঢাকে,
অমনই সে আসে,
রেখারিক্ত ভাবচ্ছবি, অবচ্ছিন্ন স্মৃতির উদ্ভাসে
লাক্ষণিক,—নেত্রসার, কপোলপ্রধান
প্রাক্‌প্রচ্ছদ নটী যেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘোচে ব্যবধান
দৃশ্য ও দ্রষ্টার মধ্যে ঃ ভুলে যাই
উত্তরচল্লিশ আমি ; উদ্‌গ্রীব হয়েও যদি চাই,
তবু গলকম্বলের থর
মুকুরের অধিকাংশ জোড়ে ; নতোদর

শঙ্কায় পায়ের ডগা অধোমুখে কচিৎ তাকালে ;
স্থানবিনিময় করে চাঁদিতে কপালে,
চুলের প্রলেপ ওড়ে নামমাত্র বাতাসে যখন।

বীমাই জীবন
বুঝি বটে, কিন্তু ঠিক মাসে মাসে কিস্তির যোগান
দিতে গিয়ে বাজারখরচে পড়ে টান।
অথচ ডাক্তারে বলে তন্তুক্ষয়
এ-বয়সে নিতান্ত নিশ্চয় ;
পুষ্টিকর পথ্য বিনা অতএব গত্যন্তর নেই ;
এবং যেকালে আজও রয়েছি বেঁচেই,
তখন কী ক'রে মরি, মৌরসের উচ্ছেদ না হোক,
অন্তত চৌধুরীদের ভদ্রাসনক্রোক্
স্বচক্ষে না দেখে ঃ
তাতে যদি দুলালেরা নম্রতা বা কাণ্ডজ্ঞান শেখে ॥

বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে ভুলি সে-সকলই ;
এ-বাড়ির অনুমিত গলি
মনে হয় অগ্রণীর পদপ্রার্থী পথ,
যার প্রান্তে মুদ্রিত জগৎ
স্ফূর্তির প্রতীক্ষা করে।
তখন থাকে না মনে—দিগন্তরে
উচ্ছিষ্ট উঞ্ছের বাটোয়ারা,
হিংসার প্রমারা,
স্থগিত মারীর বীজ শস্যশূন্য মাঠে ;
চ'ড়ে বসে নিহত বা নির্বাসিত স্বৈরীদের পাটে
প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বেসর্বা যত ; নিরর্থক
পুষার একর্ষি নাম, অসূর্যের পুরাণ ঝলক,
হিরন্ময় পাত্র ঠেলে ফেলে,
দেয় মেলে
অন্ধ তম অতিপ্রজ বল্মীকে বল্মীকে ;
বিমানের ব্যূহ চতুর্দিকে.

মাতরিশ্বা পরিভূ কবির কণ্ঠশ্বাস।
মূল্যহ্রাস
সর্বত্র সর্বথা
আবশ্যিক,—বোঝে না সে-সোজা কথা
শুধু যার ভূসম্পত্তি আছে ;
উদয়াস্ত ভেবে মরি,—খেয়ে প'রে নেহাৎ যা বাঁচে
নির্ভয়ে তা খাটাতে পারি না।
অথচ প্রত্যহ শুনি চার্চিলের স্বেচ্ছাচার বিনা
অসাধ্য সাম্রাজ্যরক্ষা, অব্যর্থ প্রলয়,
এবং যে-ব্যক্তিস্বত্ব সভ্যতার সম্মত আশ্রয়,
তারও অব্যাহতি নেই অপঘাত থেকে ঃ
একা হিট্‌লারের নিন্দা সাধে আজ বাধে কি বিবেকে ?

কিন্তু তার দিব্য আবির্ভাবে
প্রেতার্ত অভাবে
জাগে যেন প্রজ্ঞাপারমিতার অভয় ;
ক্লেদ-মেদ-খেদের আলয়—
জঘন্য জান্তব দেহে দেশ-কাল-সংকলিত মল
সংসক্ত থাকে না আর; তন্মাত্রাসম্বল
হয় তনু আচম্বিতে।
নির্বিকার স্বপ্নের নিভৃতে,
বিয়োগান্ত নাটকের উদ্যোগী নায়ক, আমি পাতি
যৌবরাজ্য,—ব্যোমযান, কামান, পদাতি
যে-রাষ্ট্রের অংগ নয়; ন্যায়, ক্ষমা, মিতালী, মনীষা
যার মুখ্য অবলম্ব, জিজীবিষা
সামান্য লক্ষণ ;
শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন,
দুরাক্রম্য নয় গিরিচূড়া,
পরিস্রুতসুরা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন,
সুবর্ণধারার শষ্পশ্যামল পুলিন
উৎপিঞ্জর তারুণ্যের লাস্যময় লীলায় মুখর,

গন্ধবহসম্মার্জিত স্বয়ম্ভূ অম্বর
দেয় ফিরে
অবরোহী সন্ধ্যার শিশিরে
অনুপূর্ব মানুষের অভ্যুদিত চিত্তের প্রসাদ ;
জয়যুক্ত স্ট্রেসেমান্-ব্রিয়াঁর সংবাদ ॥

হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।
প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরের মতো ;
এবং উদ্বাস্তু ট্রট্স্কি ইতিমধ্যে দেশে দেশান্তরে
ঘুরে মরেছিল, পুরাকালীন শহরে
গলঘণ্ট কুষ্ঠরোগী যত দ্বার সব বন্ধ দেখে
যেমন নির্জনে যেত ভিক্ষাব্যতিরেকে।
কিন্তু তার
বভ্রু কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার,
সংহত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
তাচ্ছিল্যের দামিনীবিলাস ;
গ্যেটে, হ্যেল্ডার্লিন্, রিল্কে, টমাস্ মানের উপন্যাস
দেওয়ালের খোপে খোপে, বাখের সনাটা
ক্লাভিয়েরে, শতায়ু ওকের পাটা
তেজস্ক্রিয় উৎকোণ পটলে ;
বায়ব্য অঞ্চলে
রক্ষিত মঙ্গলদীপ, অনাদি নগরী,
মালা জ'পে, কাটায় শর্বরী
স্বপ্নাবিষ্ট সভ্যতার নিশ্চিন্ত শিয়রে।
লেগেছিল হাস্যকর স্বভাবত সে-সবের পরে
কূটাগার থেকে দেখা স্বস্তিকলাঞ্ছন

বালখিল্য নাট্সাঁদের সমন্বয় নামসংকীর্তন
মশালের ধূম্রার্ত আলোকে ঃ
বরঞ্চ বৃষ্টির দিনে স্তব্ধশোকে
নির্বাক বিদায়
স্মরণীয় স্বস্থ মর্যাদায় ॥

অবশ্য বুঝেছি আজ এ-সিদ্ধান্ত নিতান্তই মেকী ;
কারণ অন্বয়ব্যতিরেকী
সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত,
এবং সে-নিত্যবিপরীত
দ্বন্দ্বসমাসের সঙ্গে তুলনীয় মেরুবিপর্যয়
বিকল্পস্বভাব ক্ষেত্রে। নিঃসংশয়
উপরন্তু এও
বিশ্বামিত্র দস্যুরাই ব্যক্তিনামধেয়
যদিচ প্রাজ্ঞের মতে, তবু ব্যষ্টিসংকল্পের ঝোঁকে
প্রাগুক্ত দোলকে
কখনও বিলম্ব ঘটে, কদাচিৎ দ্রুতি।
তবে কেন ভোলে প্রতিশ্রুতি ?
বারোটা উত্তীর্ণ, কিন্তু টেলিফোন করে কই লীলা ?
অথচ রঙিগলা
নয় সে দীপ্তির মতো; অন্তত সে জানে
সমাজের ঘুম নেই, শ্রুতি আছে দেওয়ালের কানে ;
গোপন সুযোগ
নিতান্ত দুর্লভ তাই, উপভোগ
পরিণামচিন্তায় ব্যাহত।
তাহলে কি অসময়ে ফিরেছে প্রমথ
নিন্দুকের প্রেরণায় ? এত দিনে সফল নতুবা
সে-বাচাল যুবা
যার পেশা কুতীর সম্ভ্রমহানি ?
ইচ্ছার সামর্থ্য নেই মানি;
তথাপি টাঁকার আজ্ঞা প্রলয়েও লঙ্ঘনীয় নয় ঃ
বন্ধকীর নিলামে বিক্রয়

মারোয়াড়ীদের গ্রাসে তুলে দেয় বাঙালীর দায়।
সুতরাং যে মাঝারীবয়সীকে চায়,
সে নিশ্চয় প্রকৃতিভিখারী,
নচেৎ বিকারী ॥

বৃথা স্বপ্ন ; সংকল্প অক্ষম ;
মতিভ্রম
বৃষ্টির বিবিক্ত দিনে অসংলগ্ন স্মৃতির সংগ্রহে
কিম্বা শুধু মৌখিক বিদ্রোহে
নিঃসঙ্গ জরার আর্তি ভোলার প্রয়াস।
কিন্তু মানবেতিহাসে মাঝে মাঝে আসে মলমাস,
কর্মচ্যুত পৃথিবী যখন
উন্মার্গ ঘুমের ঘোরে, নাক্ষত্রিক সহযাত্রীগণ
সে-অপচারীকে ভুলে ছোটে লোকাতীতে ;
নির্বাণ নিশীথে
কারারুদ্ধ আয়ুর মিয়াদ,
রোমন্থ বিস্বাদ,
বিষায়িত ভবিষ্যের ধ্যান,
অভিজ্ঞান
শকুন্তের স্পর্শকলুষিত।
প্রমাবিরহিত
অন্ধ বিশ্বাসের বশে তখন মানুষ খোঁজে ফের
অশক্ত বা অসম্পৃক্ত অধিদৈবতের
পুরাতন পদপ্রান্তে সংগতি বা পৈতৃক অমিয়,
কার্যত যদিও
ঐকান্তিক শূন্য তাকে করে বিশ্বম্ভর ;
কারণ তখন বায়ু অনিলে মেশে না, অবস্কর
ভস্মান্ত হয় না, অনুব্যবসায়ী ক্রতু
বোঝে সন্তাপেও ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীতাগ্নি বেপথু।
অন্তর্হিত আজ অন্তর্যামী :
রুষের রহস্যে লুপ্ত লেনিনের মামি,
হাতুড়িনিষ্পিষ্ট ট্রট্স্কি, হিট্লারের সুহৃদ স্টালিন্,
মৃত স্পেন, ম্রিয়মাণ চীন,

কবন্ধ ফরাসীদেশ। সে এখনও বে'চে আছে কি না,
তা সন্ধে জানি না ॥

মণীশ ঘটক (১৯০১-)

৭০ পরমা

আর কেহ বুঝিবে না ; তোমাতে আমাতে
এ বোঝাপড়ার পালা সাঙ্গ করে যাবো আজ রাতে
অন্তরঙ্গ আলাপনে।
রাত্রির অঞ্চল সঞ্চালনে
শান্ততর, স্নিগ্ধতর হয়ে এলো বায়ু,
তৃতীয়ার চন্দ্রের প্রমায়ু
হোলো শেষ। মেঘলোক হয়ে পার
ঘনিষ্ঠ আশ্লেষ রচে পরম আত্মীয় অন্ধকার।
হলা পিয় সহি,
জান্তব জিগীষা বক্ষে অতীতের সে নিষাদ নহি আমি নহি।
একদা যে আসঙ্গের ক্রুর আক্রমণ
সবিদ্রুপে উপেক্ষিয়া কুমারীর আত্মরক্ষা-পণ
বধির বাসব-হস্তচ্যুত বজ্রসম
তোমারে করিলো চূর্ণ, আমারি নির্মম
স্বার্থ পরমার্থ দ্বন্দ্বে আজি নির্বাপিত
সে অনল, স্মৃতিভস্মস্তূপে সমাহিত।
অনলস কাল-আবর্তনে
মহীরুহ হয়েছে অঙ্গার। হয়ত পরম কোনো ক্ষণে
অঙ্গারে ফুটিবে হীরা। সে প্রসঙ্গ আজি অবান্তর।

পূর্ণলোহু যৌবনের মধ্যাহ্ন ভাস্কর
সেদিন জ্বলিতেছিলো এ দেহ-অম্বরে।
দিকে দিগন্তরে
সমীর শ্বসিতেছিলো অগ্নিবর্ষী শ্বাস।

চক্ষে ভরি' ত্রাস,
তুমি কেন ঝাঁপ দিলে সে ধ্বংস-উৎসবে ?
যৌবন গৌরবে
বল্কলশাসনমুক্ত তুঙ্গ স্তনদ্বয়
সহসা উদ্বেল হোলো শুভ্র বক্ষময়।
শিহরিলো প্রবাল অধর
কেন্দ্রীভূত কামনার চুম্বক বিথারে থরথর।
অজ্ঞাত শঙ্কায়
অপাঙ্গে অনঙ্গতীর মুহুর্মুহু থমকিলো হায়

আশ্রম-আশ্রয় ত্যজি আজন্ম তাপসী কণ্বসুতা
নিষ্কলুষা কুরঙ্গীর নৃত্যরঙ্গে হলে আবির্ভূতা।
নিষ্করুণ কিরাতের পরুষ সংস্পর্শে আচম্বিত
মদাপন্নতা,—হারালে সম্বিৎ।

হায় সখি হায়,
তুমি ত জানিলে নাকো সেই মৃগয়ায়
এক অস্ত্রে হত হোলো মৃগী ও নিষাদ।
আদিরিপু উন্মোচিলো পদ্মাবনের বাঁধ,
সেই পথ দিয়া
প্রেম এলো বন্যাসম দুকূল প্লাবিয়া
সুগম্ভীর সমারোহে।
অনাদ্যন্ত আজো তাহা বহে

দুর্বার প্রবাহে তুলি উন্মত্ত কল্লোল,
আমার নিখিল তারই উল্লাসে আজিও উতরোল !

প্রমথনাথ বিশী (১৯০২-)

৭১ নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা

নিঃসঙ্গ সন্ধ্যার তারা,
দ্বিতীয়ার চাঁদ,
নীলাভ পদ্মার ধারা, শূন্যতা অগাধ।
স্তিমিত হংসের দল,
পশ্চিম বনান্ততল
ম্লান কাঁদ কাঁদ; শূন্যতা অগাধ ॥

শুধু দুটি মুগ্ধ প্রাণী,
শূন্য শর বন,
পদ্মার নাহিকো বাণী, স্বপন-নির্জন।
অসীম রাত্রির পানে
যায় তারা কোন্‌খানে
ছায়ার মতন ! স্বপন নির্জন ॥

৭২ হে পদ্মা

হে পদ্মা তোমার
বনরেখা বিবর্জিত দিগন্তের দেশে
ডুবে যায় ক্লান্ত রবি গলিয়া নিঃশেষে
বিন্দুমাত্র সার।

নিশ্চপল জলতল যেন একটানা
ধূমল পাটল এক বাদুড়ের ডানা
করিছে বিস্তার।

পশ্চিমে ত্রিবলী বর্ণ; কানন নিবিড়;
মুহুর্মুহু স্বচ্ছ ছায়া হ'তেছে গভীর;
নৃত্যশীল ভঙ্গী যেন লঘু ওড়নাটির
বিদ্যুৎপর্ণার।
হে পদ্মা তোমার!

*

নদীতে শেহলা শ্যাম; রোদে পোড়া ঘাস,
দগ্ধ মাঠে উঠিতেছে উদ্ভিজ্জ সুবাস
শিশিরের স্পর্শ লভি; বিমূঢ় বাতাস
গন্ধে আপনার।
হে পদ্মা তোমার!

ধূম্রাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলির।
তালে তালে দাঁড় ফেলা ক্বচিৎ তরীর।
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার!
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্ত আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা-তারকার।
হে পদ্মা তোমার!

৭৩ প্রাচীন আসামী হইতে

পশ্চিম দিগন্ত আমি জ্বলন্ত রবির
বাসনার চিতাশয্যা; তুমি সখী দূর,
পূর্ববনান্তের রেখা—অতল গভীর
রহস্যের অধিনেত্রী! মোরে দগ্ধ করি
জ্বালাই বহ্নির শিখা—তারি দৃপ্ত রাগে
হেরিতেছি কান্তি তব মূর্চ্ছায় বিধুর।
মিলিয়াছে তব অঙ্গে দিবসশর্বরী,
দেখা-না-দেখার প্রান্তে তব মূর্তি জাগে।

কোথা তুমি, কোথা আমি, শূন্যতা অগাধ,
বুকে বুকে পরশন ঘটিল না কভু !
কেবল চুলের গন্ধ, শয্যা ক্ষুধাতুর,
শুধু সৌন্দর্যের কশা—কষায়-মধুর !
উঠিল গভীর রাত্রে দ্বাদশীর চাঁদ—
অখণ্ড দিগন্তে হেরি ঘেরা দোঁহে তবু।

৭৪ বলো, বলো, বলো

তুমি আমার মনের কথা জেনে ফেলেছো
ওইখানে তোমার জিত।
আমি তোমার মনের কথা
জানতে পারলাম কই ?
আপন অন্তরের অগাধ রহস্যের মধ্যে ব'সে আছো
অমাবস্যার করপুটে
দ্বিতীয়ার চন্দ্রকলাটির মতো,
ঠিক একটুকু আলো
যাতে দেখা না দিয়েও দেখতে পারো অনায়াসে।

সত্যি তোমায় জানতে পারলাম কই ?

যদি বলি তোমায় ভালোবাসি,
তুমি হাসো।
যদি শুধাই আমায় ভালোবাসো ?
বলো—না।
এত নিশ্চিত, এত অসংশয়।
মরুভূমির সূর্যোদয়ও বুঝি
এত নিষ্কলুষ নয়।
যদি বলি কেন ভালোবাসো না ?
অমনি বলো কেনর উত্তর নেই।

এত দিনেও ওই প্রশ্নটির উত্তর পেলাম না।
ছোট একটি প্রশ্নের কি মহতী সম্ভাবনা।
কেবলি শুধাই কেন, কেন, কেন ?
কেবলি উত্তর পাই, কেনর আবার উত্তর কি ?

ওই উত্তরহীন উত্তর দেবার সময়ে
কখনো মুখ তুলে চাওনি।
হঠাৎ একদিন চোখে চোখে গেল ঠেকে,
প্রত্যাশিত উত্তর গেল বেধে,
শুধু বললে—তুমি না কবি ?
বললে, কবিরা নাকি অন্তর্যামী !

না গো না, তবে আমিও বলি,
আমি কবি নই, শিল্পী নই,
আমি অন্তর্যামী নই।
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চোখে প্রস্ফুটিত
মানস সরের অন্তর্ভেদী
উদ্যত, উদ্গত উদ্ধত পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো।

আমি মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত,
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অধরে,
তোমার সীঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি
সূর্য কিরণে কাচ নারিকেলগুচ্ছ
যেমন চোখ ঝলসিয়ে দিতে থাকে, তেমনি !

প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টলোমলো ক'রে উঠুক
তোমার অন্তরের শুক্তিনিঃসৃত
একটিমাত্র মুক্তার মতো
বলো, বলো, বলো ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-)

৭৫ প্রথম যখন

প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, কয়েছিলে মৃদুভাষে
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত',—কিছুতে মনে না আসে।
কালি পূর্ণিমা রাতে
ঘুমায়ে ছিলে কি আমার আতুর নয়নের বিছানাতে ?
মোর জীবনের হে রাজপুত্র, বুকের মধ্যমণি,
প্রতি নিঃশ্বাসে শুনেছি তোমার স্তব্ধ পদধ্বনি !
তখনো হয়ত আঁধার কাটেনি,—সৃষ্টির শৈশব,—
এলে তরুণীর বুকে হে প্রথম অরুণের অনুভব !
আমি বলেছিনু, 'জানি,
স্তবগুঞ্জন তুলি তোরে ঘিরে' হে মোর মক্ষিরাণি !'
যাপিলাম কত পরশতপ্ত রজনী নিদ্রাহীন,
দু'চোখে দু'চোখ পাতিয়া শুধালে, 'কোথা ছিলে এতদিন ?'
লঘু দুটি বাহু মেলে'
মোর বলিবার আগেই বলিলে : 'যেয়ো না আমারে ফেলে।'
আজি ভাবি বসে' বহুদিন পরে ফের যদি দেখা হয়,
তেমনি দু'চোখে বিশ্বাসাতীত জাগিবে কি বিস্ময় ?
কহিবে কি মৃদুহাসে ;
'কোথায় তোমারে দেখেছি বল ত, কিছুতে মনে না আসে ॥'

৭৬ প্রিয়া ও পৃথিবী

নিঃশঙ্ক, নিঃশব্দপদে একদিন এসেছিল কাছে
ঈপ্সিত মৃত্যুর মত ; নয়নে যেটুকু বহ্নি আছে,
অধরে যেটুকু ক্ষুধা—সব দিয়ে লইলাম মুছে
লোলুপ লাবণ্য তব; দিনান্তের দুঃখ গেল ঘুচে,
উদিল সন্ধ্যার তারা দিগ্‌বধূর ললাটের টিপ।
কদম্বপ্রসব সম জ্বলে' ওঠে কামনাপ্রদীপ,
যুগ্ম দেহে; শ্মশানে অতসী হাসে, নিকষে কনক;
মেঘলগ্ন ঘনবল্লী আকুল পুলকে নিষ্পলক।
কঙ্করে অঙ্কুর জাগে, মরুভূমে ফুটিলো মালতী—
তুমি রতি মূর্তিমতী, আর আমি আনন্দ-আরতি !
দেহের ধূপতি হ'তে জ্ব'লে ওঠে বাসনার ধূনা
লেলিহরসনা তবু কালো চোখে কোমল করুণা।
শুভ্র ভালে খেলা করে তৃতীয়ার ম্লান শিশু শশী,
তোমার বরাঙ্গ যেন সন্ধ্যা স্নিগ্ধ, শ্যামল তুলসী।
ভুজের ভুজঙ্গতলে হে নতাঙ্গী, নির্ভয় নির্ভরে
তোমার স্তনাগ্রচূড়া কাঁপিলো নিবিড় থরথরে !
স্ফুরৎপ্রবাল ওষ্ঠে গূঢ়ফণা চুম্বন উৎসুক,
একপারে রক্তাশোক, অন্যতটে হিংসুক কিংশুক।
শ্লথ হ'লো নীবিবন্ধ, চূর্ণালক, শিথিল কিঙ্কিণী,
কজ্জলে মলিন হোলো পাণ্ডু গণ্ড, কাটিলো যামিনী।
দূরে বুঝি দেখা দিলো দিগ্বালার রজত-বলয়,
বলিলাম কানে কানে ঃ 'মরণের মধুর সময়।'

আজি তুমি পলাতকা, মুক্তপক্ষ পাখি উদাসীন,
ক্লান্ত, দূরনভোচারী দিগন্তের সীমান্তে বিলীন।
বিদ্যুৎ ফুরায়ে গেছে, কখন বিদায় নিলো মেঘ,
অবিচল শূন্যতার নভোব্যাপী নিস্তব্ধ উদ্বেগ
আবরিয়া রহিয়াছে হৃদয়ের অনন্ত পরিধি।
চাহি না ঘৃণিত মৃত্যু, তব গুপ্ত, হীন প্রতিনিধি।

নীবিবন্ধ শিথিলিতে কটিতটে যদিও কিঙ্কিণী
বাজে আজো, কজ্জলে মলিন গণ্ড, তবু, কলঙ্কিনি,
চাহি না অতীত মৃত্যু। নভস্তলে অনিবদ্ধনীবি
ঘুম যায় পার্শ্বে মোর বীরভোগ্যা প্রেয়সী পৃথিবী।
তা'রে চাই; তাহারি সুধার তরে অসাধ্য সাধনা,
বিস্মিত আকাশ ঘিরি' সস্মিত, সুনীল অভ্যর্থনা,
অজস্র প্রশ্রয়। মৃত্তিকার উদ্বেলিত পয়োধরে
সম্ভোগের সুরস্রোত ওষ্ঠাধরে উচ্ছ্বসিয়া পড়ে,
শস্য ফলে, নদী বহে, ঊর্ধ্বে জাগে উত্তুঙ্গ পর্বত,
হাস্য করে মৌনমুখে উলঙ্গ, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
আয়ুর সমুদ্র মোর দুই চক্ষে, মৃত্যু পদলীন,
তোমার বিস্মৃতি দিয়া পৃথিবীরে করেছি রঙীন।
নক্ষত্র-আলোক হ'তে সমুদ্রের তরঙ্গ অবধি
বহে' চলে একখানি পরিপূর্ণ যৌবনের নদী।
তা'রি তলে করি স্নান, নাহি কূল, নাহি পরিমিতি,
তুমি নাই, আছে মুক্তি, পৃথ্বীব্যাপী প্রচুর বিস্মৃতি।

৭৭ রবীন্দ্রনাথ

আমি ত' ছিলাম ঘুমে,
তুমি মোর শির চুমে'
গুঞ্জরিলে কী উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানেঃ
চল রে অলস কবি
ডেকেছে মধ্যাহ্ন-রবি
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

চমকি' উঠিনু জাগি,'
ওগো মৃত্যু-অনুরাগী
উন্মুখ ডানায় কোন্ অভিসারে দূর-পানে ধাও,
আমারো বুকের কাছে
সহসা যে পাখা নাচে—
ঝড়ের ঝাপট লেগে হয়েছে সে উন্মত্ত উধাও।

দেখি চন্দ্র-সূর্য-তারা
মত্ত নৃত্যে দিশাহারা,
দামাল যে তৃণশিশু, নীহারিকা হয়েছে বিবাগী,
তোমার দূরের সুরে
সকলি চলেছে উড়ে
অনির্ণীত অনিশ্চিত অপ্রমেয় অসীমের লাগি'।

আমারে জাগায়ে দিলে,
চেয়ে দেখি এ-নিখিলে
সন্ধ্যা, ঊষা, বিভাবরী, বসুন্ধরা-বধূ বৈরাগিণী ;
জলে স্থলে নভতলে
গতির আগুন জ্বলে
কূল হ'তে নিল মোরে সর্বনাশা গতির তটিনী।

তুমি ছাড়া কে পারিত
নিয়ে যেতে অবারিত
মরণের মহাকাশে মহেন্দ্রের মন্দির-সন্ধানে ;
তুমি ছাড়া আর কা'র
এ উদাত্ত হাহাকার—
হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-)

৭৮ আমি কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের !

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের,
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হায় নাই !

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু,
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়,
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায় !

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই
কুম্ভকারের চাকা,
আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি
দুঃসাহসের পাখা,
অভ্রংলিহ মিনার-দম্ভ তুলি,
ধরণীর গূঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অংগুলি !

জাফ্‌রি-কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারংগ
ঘনায় নিশীথ মায়া।

দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত
সে দুটি আঁখির কোলে,
বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের
মধুর মিনতি দোলে,
সে মিনতি রাখি সময় যে হায় নাই,
বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে
সেথা যে চারণ চাই !

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের।

কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ !
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
হাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়;
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই কুঠার-ঘায়।

সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাতি পথ চায়,
হায় সময় নাই !

৭৯ নীল দিন

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
কত ঝড়, অন্ধকার মেঘ,
আকাশ কি সব মনে রাখে !
আমারও হৃদয় তাই
সব কিছু ভুলে গিয়ে
হ'ল আজ সুনীল উৎসব !

তুমি আছ, তুমি আছ,
এ বিস্ময় সওয়া যায় না ক;
অরণ্য কাঁপিছে।
মনে মনে নাম বলি,
আকাশ চুইয়ে পড়ে
গলানো সোনার মত রোদ।

গলানো সোনার মত
রোদ পড়ে সব ভাবনায়;
সোনার পাখায়
গাহন করিতে ওঠে
নীল বাতাসের স্রোতে
রৌদ্রমত্ত পায়রার ঝাঁক।

এ নীল দিনের শেষে
হয়ত জমিয়া আছে
সূর্য-মোছা মেঘ রাশি রাশি
তবু আজ হৃদয়ের
ভরিয়া নিলাম পাত্র
এই নীল স্বপ্নের সুধায়।

হৃদয়েরে কত পাকে
স্মরণ জড়ায়ে রাখে
মরণ শাসায়।
তবু মুহূর্তের ভুল
ক্ষীণায়ু স্ফুলিঙ্গ তবু
অন্ধকারে হাসিয়া উঠুক।

শীতল শূন্যতা হতে
উল্কা আসে পৃথিবীর
নিষ্করুণ নিশ্বাসে জ্বলিতে;
স্টেপির দিগন্তে দেখি
আগু-পিছু তুষারের
মাঝখানে ফুলের প্লাবন।

তোমার নয়ন হতে
আজিকার নীল দিন
জীবনের দিগন্তে ছড়ায়;
মিছে আজ হৃদয়েরে
স্মরণ জড়াতে চায়
মরণ শাসায়।

৮০ ফেরারী ফৌজ

নীলনদীতট থেকে সিন্ধু-উপত্যকা,
সুমের, আক্কাড আর গাঢ় পীত হোয়াংহোর তীরে,
বারবার নানা শতাব্দীর
আকাশ উঠেছে জ্বলে, ঝলসিত যাদের উষ্ণীষে,
সেই সব সেনাদের
চিনি, আমি চিনি;
—সূর্যসেনা তারা,
রাত্রির সাম্রাজ্যে আজো
সন্তর্পণে ফিরিছে ফেরারী।

মাঝরাতে একদিন
বিছানায় জেগে উঠে বসে,
সচকিত হয়ে তারা
শুনেছে কোথায় শিঙা বাজে,
সাজো সাজো, ডাকে কোন অলক্ষ্য আদেশ।

জনে জনে যুগে যুগে
বার হয়ে এসেছে উঠানে,
আগামী দিনের সূর্য দেখেছে আঁধারে
গুঁড়ো গুঁড়ো করে সারা আকাশে ছড়ানো।

সহসা জেনেছে তারা,
এই সব সূর্য-কণা তিল তিল করে
বয়ে নিয়ে যেতে হবে কালের দিগন্তে,
রাত্রির শাসন-ভাঙা
ভয়ংকর চক্রান্তের গুপ্তচর রূপে।

এক একটি সূর্য-কণা তুলে নিয়ে বুকে,
দুরাশার তুরঙ্গে সওয়ার
দুর্গম যুগান্ত-মরু পার হবে বলে,
তারা সব হয়েছে বাহির।

সুদূর সীমান্ত হায়
তারপর সরে গেছে প্রতি পায়ে পায়ে;
গাঢ় কুজ্ঝটিকা এসে
মুছে দিয়ে গেছে সব পথ;
ভয়ের তুফান-তোলা রাত্রির ভ্রূকুটি
হেনেছে হিংসার বজ্র।
দিগ্বিদিক-ভোলানো আঁধারে
কে কোথায় গিয়েছে হারিয়ে।

রাত্রির সাম্রাজ্য তাই এখনো অটুট!
ছড়ানো সূর্যেরকণা
জড়ো করে যারা
জ্বালাবে নতুন দিন,
তারা আজো পলাতক,
দলছাড়া ঘুরে ফেরে দেশে আর কালে।

তবু সূর্য-কণা বুঝি হারাবার নয়।
থেকে থেকে জ্বলে ওঠে শাণিত বিদ্যুৎ
কত ম্লান শতাব্দীর প্রহর ধাঁধিয়ে

কোথা কোন লুকানো কৃপাণে
ফেরারী সেনার।

এখনো ফেরারী কেন ?
ফেরো সব পলাতক সেনা।
সাত সাগরের তীরে
ফৌজদার হেঁকে যায় শোনো ;
আনো সব সূর্য-কণা
রাত্রি-মোছা চক্রান্তের প্রকাশ্য প্রান্তরে।
—এবার অজ্ঞাতবাস শেষ হলো ফেরারী ফৌজের।

৮১ কাক ডাকে

খাঁখাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর ;
আকাশ উপুড় করে ঢেলে-দেওয়া
অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ককণ্ঠ কাক !
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, ক্ষুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

মানুষের কথা বুঝি শুনেছি সকলই ;
মনের অরণ্যে যত হাওয়া তোলে
কথার মর্মর,
বেদনা ও ভালোবাসা
উদ্দীপনা, আশা ও আক্রোশ,

জেনেছি সমস্ত দোলা।
সব ঝড় পার হয়ে, আছে এক
শব্দের নীলিমা,
অন্তহীন, নিষ্কম্প, নির্মল।

কোথায় কাদের ছাদে সমস্ত দুপুর
কাক ডাকে, শুনি।
বোঝা আর বোঝাবার
প্রাণান্ত ক্লান্তির শেষে
অকস্মাৎ খুলে যায় আশ্চর্য কবাট।
কাক ডাকে, আর,
সে শব্দের ধুধু করা অপার বিস্তার
হৃদয়ে ছড়ায় সব শব্দের অতীত
ধ্যান-গাঢ় প্রশান্তির মতো।
আবার বিকেল হবে,
রোদ যাবে পড়ে,
মানুষ মুখর হবে
মাঠে আর ঘরে।
বোঝাপড়া লেনদেন
প্রত্যহের প্রসঙ্গ প্রচুর
মন জুড়ে রবে।
ক্ষণে ক্ষণে তবু সব সুর
কেটে দিতে পারে এক কাক-ডাকা গহন দুপুর।
সমস্ত অর্থের গ্রন্থি ধীরে ধীরে খুলে,
প্রত্যহের ভাষা তার সব ভার ভুলে,
উত্তরিতে পারে এক নিষ্কম্প নিথর
নভোনীল অপার বিস্ময়ে!

৮২ পাখিদের মন

নির্জন প্রান্তরে ঘুরে হঠাৎ কখন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন।

আর শুধু মাটি নয় শস্য নয়,
নয় শুধু ভার ;
আর এক বিদ্রোহী ধিক্কার—
পৃথিবী-পরাস্ত-করা উজ্জ্বল-উৎক্ষেপ।
আজো এরা মাঠে ঘাটে মাটি খুঁটে খায়,
মেনে নেয় সব কিছু দায়;
তবু এক সুনীল শপথ
তাদের বুকের রক্ত তপ্ত করে রাখে।
জীবনের বাঁকে বাঁকে, যত গ্লানি যত কোলাহল
ব্যাধের গুলির মতো বুকে বিঁধে রয়;
সে উত্তাপে গলে গিয়ে হয়ে যায় ক্ষয়।
শুধু দুটি তীব্র তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী ডানা,
আকাশের মানে না সীমানা।
কোনোদিন এ-হৃদয় হয় যদি একান্ত নির্জন,
হয়তো পেতেও পারি পাখিদের মন
—আর এক সূর্য সচেতন।

৮৩ নীলকণ্ঠ

হাওয়াই দ্বীপে যাইনি, দক্ষিণ সমুদ্রের কোনো দ্বীপপুঞ্জে।
তবু চিনি ঘাসের ঘাগরাপরা ছায়াবরণ তার সুন্দরীদের;
—বিদেশী টহলদারের ক্যামেরা-কলুষিত চোখে নয়।

দেখেছি তাদের ঘাসের ঘাগরায় নাচের ঢেউএর হিল্লোল,
নোনা হাওয়ার দমকে দমকে যেমন নারকেল-বনের দোলা।

মোহিনী পলিনেসিয়া !
মহাসাগরে ছড়ান
ভেঙে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া কোন সুদূর সভ্যতার নাকি
ভগ্নাংশ।
আমি জানি,
সমুদ্রের ঔরসে
প্রবাল দ্বীপের গর্ভে তার জন্ম !

সূর্যের ঔরসে
মহারণ্যের গর্ভে যার জন্ম
আঁধার-বরণ সেই আফ্রিকাকেও জানি;
—সৌখিন শিকারী আর পণ্ডিত-পর্যটকের চোখে নয়।

অরণ্য-চোঁয়ানো ঝাপসা আলোয়
কি, দিগন্ত-ছোঁয়া 'ফেল্টে'র চোখ-ঝলসানো উজ্জ্বলতায়
উদ্দাম আঁধার-বরণ আফ্রিকা!
কণ্ঠে তার দুরন্ত আরণ্য উল্লাস
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
কালো চামড়ার ছোঁয়াচ বাঁচাতে
কালো মনের ছোঁয়াচে রোগে জর্জর
মার্কিন ক্লীবের প্রলাপ-প্রতিধ্বনি নয়।
রাত্রি-নিবিড়, অরণ্য-গহন আফ্রিকার
রোমাঞ্চিত উত্তাল উচ্চারণ,

—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
অরণ্য ডাকে ওই,—যাই!
সিংহের দাঁতে ধার, সিংহের নখে ধার
চোখে তার মৃত্যুর রোশ্‌নাই
—হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
বন-পথে বিভীষিকা বিঘ্ন,
আমাদেরও বল্লম তীক্ষ্ণ!
কাপুরুষ সিংহ ত' মারতেই জানে শুধু
আমরা যে মরতেও চাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
মেয়েদের চোখ আজ চক্‌চকে ধারালো;
নেচে নেচে ঢেউ-তোলা নাচের নেশায় দোলা
মিশ্‌কালো অঙ্গে কি চেকনাই!
মৃত্যুর মৌতাতে বুঁদ হয়ে গেছি সব
রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!
হে-ইডি, হাইডি, হা-ই!

আমাদের গলায় কই সেই উদ্দাম উল্লাস,
যাদের খাগরার দুরন্ত সমুদ্র-দোলা ?
কেমন করে থাকবে !
আমাদের জীবনে নেই জ্বলন্ত মৃত্যু,
সমুদ্র-নীল মৃত্যু পলিনেসিয়ার !
আফ্রিকার সিংহ হিংস্র মৃত্যু !
আছে শুধু স্তিমিত হয়ে নিভে যাওয়া,
—ফ্যাকাশে রুগ্ন তাই সভ্যতা।

সভ্যতাকে সুস্থ করো, করো সার্থক।
আনো তীব্র তপ্ত ঝাঁঝালো মৃত্যুর স্বাদ,
সূর্য আর সমুদ্রের ঔরসে
যাদের জন্ম,
মৃত্যু-মাতাল তাদের রক্তের বিনিময়।

ভরাট-করা সমুদ্র তার উচ্ছেদ-করা অরণ্যের জগতে
কি লাভ গড়ে কৃমি-কীটের সভ্যতা,
লালন করে' স্তিমিত দীর্ঘ পরমায়ু
কচ্ছপের মত।
অ্যামিবারও ত' মৃত্যু নেই।
মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ !

অন্নদাশঙ্কর রায় (১৯০৪-)

৮৩ 'জর্নাল' থেকে

পদ্মার চর

সারাদিন ভর পদে পদে ব্যর্থতা
তিক্ত মনের বিরস রুক্ষ কথা
আনন্দ আশা তিলে তিলে লাঞ্ছিত—
এই কি মোদের বহুদিবাবাঞ্ছিত
পদ্মার চরে বাস।

নির্জন দ্বীপ, ভেক মক মক করে
আকাশ জ্বলিছে তারার সলিতা ধরে
জলের সঙ্গ জাগায় কী অনুভব
মন্দ্র তালে বাজে কল্লোল কলরব
বায়ু বহে উচ্ছ্বাস।

মেঘ বেগ

গুরু মন্থর মেঘের সঙ্গে লঘু চঞ্চল মেঘের
নভ প্রাঙ্গণে বায়ুরথে আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেগের।
ঘর্ষণে ওঠে ঘর্ঘর রব তাহার সঙ্গে মেশা
রথতুরঙ্গ ধাবন রভসে সঘনে ছাড়ে যে হ্রেষা।
খুরেতে চাকায় চকমকি ঠোকে ফুলকি ছোটায় ছড়ায়
ব্যোম মার্গের দীপ্তি সে আসি দিক বলে দেয় ধরায়॥

কবির প্রার্থনা

রহুক আমার কাব্যে বালার্কময়ূখচ্ছটা শতবর্ষ মেঘ
বিহঙ্গের গীতিমুক্তি বনস্পতিপরমায়ু মৃত্তিকার রস
শিশিরের স্বচ্ছ সুখ শিশুর শুচিতা পশুদের নিরুদ্বেগ
সর্বশেষে শর্বরীর প্রশান্ত অম্বরতলে নারীর পরশ॥

৮৫ 'রাখী'র উৎসর্গ

আমরা দুজনা দুই কাননের পাখী
একটি রজনী একটি শাখার শাখী
তোমার আমার মিল নাই
তাই বাঁধিলাম রাখী।

৮৬ দিলীপদাকে

তোমায় বলেছি পলাতক, বলে হেসেছি কত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
তুমি তো পালালে সংসার হতে সুসংযত!
নিয়তি, আমার নিয়তি!
আমি পলাতক সংগ্রাম হতে ভীরুর মতো!

আমি রণছোড়, টিটকারী দেয় পুরুষ যত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
বলে, কাপুরুষ ! গম্বুজে বসে বাদ্যরত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
আমারি উক্তি আমারি কর্ণে বর্ষে শত !

ওদের কী বলি, কী করে বোঝাই ! সরমে নত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
জীবনের লোভে নই পলাতক সুদূরগত !
নিয়তি, আমার নিয়তি !
সৃষ্টির প্রেমে দৃষ্টি আমার প্রত্যাহত !

৮৭ খুকু ও খোকা

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো !
তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ ধানের গোলা
কারখানা আর রেলগাড়ী !
তার বেলা ?

চায়ের বাগান কয়লাখনি
কলেজ থানা আপিস-ঘর
চেয়ার টেবিল দেয়াল ঘড়ি
পিয়ন পুলিশ প্রোফেসর !
তার বেলা ?

যুদ্ধ-জাহাজ জঙ্গী মোটর
কামান বিমান অশ্ব। উট
ভাগাভাগির ভাঙাভাঙির
চলছে যেন হরির-লুট!
তার বেলা?

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

৮৮ কাঁদুনি

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়!
বাঘ নয় ভালুক নয়
নয়কো জাপানী
বোমা নয় কামান নয়
পিলে কাঁপানী।

মশা!
ক্ষুদ্র মশা!
মশার কামড় খেয়ে আমার
স্বর্গে যাবার দশা।
মশারি তো মশার অরি
শুনেছি কাহিনী
দুশমনকে দোর খুলে দেয়
পঞ্চম বাহিনী।

একাই জনবন্ধ করি
এ হাতে ও হাতে
দুই হাতেরই চাপড় বাজে
নাকের ডগাতে।

একাই
মশার কামড় নিজের চাপড়
কেমন করে ঠেকাই!
শেষে
ম্যালেরিয়ায় ধরলে আমায়
একেবারে ঠেসে।

মশায়!
দেশান্তরী করলে আমায়
কেশনগরের মশায়।
কেশনগরের মশার সাথে
তুলনা কার চালাই?
বাঘের গায়ে বসলে মশা
বাঘ বলে সে "পালাই।"
জাপানীরা ভাগ্‌ল কেন
খবরটা কি রাখেন?
কেশনগরের মশার মামা
ইম্ফলেতে থাকেন।
পলাশির সেই লড়াই যদি
কেশনগরে ঘটত
কেশনগরের মশার ঠেলায়
ক্লাইভ সেদিন হটত

মশা
তুচ্ছ মশা!
মশার জ্বালায় সেদিন হতো

ডানকার্কের দশা।

মশায় !

দেশান্তরী করলে আমায়

কেশনগরের মশায় !

হেমচন্দ্র বাগচী (১৯০৪-)

৮৯ 'গীতিগুচ্ছ' থেকে

চেয়ে চেয়ে দেখি

কতদিন চেয়ে দেখি

চোখে রঙের নেশা লাগে—

বর্ষার ভরা নদী, কাশফুল,

মাঝে মাঝে এক একখানি নৌকো ভেসে চলেছে,

গাঁয়ের লোকগুলি চলেছে নিঃশব্দে

দেখি আর মনে হয়—

এ যেন পৃথিবীর অর্ধাবগুণ্ঠিত রহস্যময় মুখ

নেপথ্যে চলেছে অযুত আয়োজন

এই চিত্রটিকে তুলে ধরবার জন্য।

বর্ষার দিনে

বর্ষার দিনে গঙ্গার তটরেখায় রেখায়

চলেছে আমার মন।

বাবলাগাছের হরিদ্রাভ ফুল—

অসংখ্য পাখীর একতান ঝঙ্কার

শালিখ পাখীর মেলা—

এই শ্যামল শোভার মধ্যেও

হৃদয়ের কান্না থামে না কিছুতেই।

বড় সুন্দর এই পৃথিবী

বড় সুন্দর এই পৃথিবী।
সাধ যায় এই
অপরূপ সবুজ শোভার মধ্যে
বেঁচে থাকি কিছুকাল।
শুধু দেখি আর স্বপ্নের মায়াভুবন
রচনা করি
অগণন মুহূর্তের ফাঁকে ফাঁকে।

ছুটি

মনে হয যেন ছুটি পেয়েছি
সমস্ত চিরাচবিত মানব-পন্থা থেকে
মুক্তি পেয়েছি আমার মনে।
ভিতরেব মানুষটাকে কে জানে ?
সে শুধু বীণা বাজায আব গান গায়
আর উদাসীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে
যেখানে শ্যামল বনের অন্তরালে
ভীরু কাঠবিড়ালী ত্বরিত-গতিতে
যাওযা-আসা করে নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ !

প্রচ্ছন্না

এক এক সময় অনুভব করি
পৃথিবীর বক্ষবিদারণ যে স্বত-উৎসারিত রসধারা,
আমি যেন তা'রই প্রান্তরেখায বিস্মিতদৃষ্টি
বালকের মত বসে আছি।
চিরকাল যেন স্তম্ভিত হ'য়ে আছে
আমার সেই মুহূর্তদর্শনের কাছে।
মনে মনে বলি,
হে প্রচ্ছন্না, তোমার গুণ্ঠন আর অপসারিত ক'রো না
অত প্রখরতা সইব কি ক'রে ?

ভাঙা কোঠাবাড়ী

অনেক দিনের ভাঙা কোঠাবাড়ী
কাঁটাল আম নারকেলের বাগানে,
তা'রই ফাঁকে ফাঁকে দেখি
একটি মেয়েকে
শ্যামল বনশোভার মত,
মনের পীড়া যে দূর করে
এমন মেয়ে।

একটি ছোট পতঙ্গ

কোথায় একটি ছোট পতঙ্গ বাসা বাঁধ্‌ছে
জামগাছের শুক্‌নো কাঠের ভিতরে।
তা'র সেই ক্লান্তিহীন কর্মের তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ
এসে লাগ্‌ছে
আমার মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে।
অপরূপ শরৎপ্রভাতে সেই শব্দ আমার কত
ভালোই না লাগ্‌ছে!
ছোট্ট একটি পাখী বারে বারে ডাকছে—
কুক্‌লি কুক্‌লি!
মনে হয়, এই উপেক্ষিত আবেষ্টনীর মধ্যে সঞ্চিত
হ'য়ে আছে চিরযুগের মধু—
তা' আমাদের কর্মক্লান্ত দৃষ্টির নেপথ্যে।

৯০ "স্বপ্নো নু, মায়া নু, মতিভ্রমো নু"

প্রতিরাত্রে আমি হংসপদিকার গান শুনি
বিরহিণী হংসপদিকা—
বহুবল্লভ দুষ্মন্তের শুদ্ধান্তবিহারিণী।
স্বপ্নে আমি চ'লে যাই কালিদাসের কালে
যখন নদীকান্তারনগরীতে সমাচ্ছন্ন সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ
কবির কাব্য যখন মেঘলোক থেকে মাটির পৃথিবীকে
প্রিয়ার পদনখের সঙ্গে উপমা দিতে অধীর—

স্বপ্নে আমি সেই কালে অবতীর্ণ হই
আর গান শুনি হংসপদিকার—
রাজউপবনে বিরহিণী নারীর মৃদু গুঞ্জরণ
মনে হয়, এ স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম !

প্রতিরাত্রে আমি আমার প্রিয়তমার গান শুনি
প্রোষিতভর্তৃকা প্রিয়তমা—
গৃহবাতায়নপার্শ্ববর্তিনী কল্যাণী বধূ—
স্বপ্নে আমি নেমে আসি আধুনিকের কালে
যখন পীড়াজর্জর ত্রস্ত জীবনে অবসর দুর্লভ,
কবির কাব্যে যখন আর প্রিয়া নেই
প্রিয়ার পদনখ যখন আর সম্মানিত হয় না কবির কাব্যে
বিচিত্র সুন্দর উপমায় আর অলংকারে;—
তখন আমি গান শুনি—
ভীত দাসজীবনের গান—
কঙ্করে আর তপ্ত মরুবালুকায়
দুঃখিনী প্রিয়তমার মুখের রেখা অঙ্কন করি
মনে হয়, এ বিরহ, না মিলন, না মৃত্যু !

রাধারাণী দেবী (১৯০৪-)

'সীঁথি-মৌর' থেকে

৯১

তোমারে বাসিয়া ভাল পূর্ণ আমি আজ।
মোর চিত্তলোকে নাহি কোনো দৈন্য আর।
হে বন্ধু ! হৃদয়াকাশে করিছে বিরাজ
পূর্ণতার পূর্ণচন্দ্র। নিখিল সংসার
আনন্দ আলোকে দীপ্ত আমার নয়নে;
কোনো-দুঃখ দুঃখ নয়, বাজে না আঘাত;
সংসারের ক্রূরতায় জ্বালা নাহি মনে।
বিধাতা আপনি যেন নিরাময়-হাত

বুলাইয়া দিয়াছেন তপ্ত এ অন্তরে
অনুভূতি কেন্দ্রে মোর। তাই সর্ব দুখ
নিজ হতে তুচ্ছ হয়ে পড়ে ঝরে ঝরে
বেদনা আনন্দ মানি, দুঃখে মানি সুখ।
কী অদৃশ্য মহাশক্তি জাগে বিশ্ব 'পর
অন্তরে ঘটায় যেবা নব-জন্মান্তর।

৯২

আমার হৃদয়দ্বারে এসেছিল যারা
প্রার্থীরূপে বহুবার, ঐশ্বর্য সম্মান
লয়ে করপুটে কেহ,—কেহ প্রেমগান
রূপ-যৌবনের অর্ঘ চরণে বা কা'রা।
অনেকে চেয়েছে বন্ধু হয়ে আত্মহারা;
বিতৃষ্ণায় গেছে ভরে বারংবার প্রাণ
সবারে করেছি তাই রূঢ়-অপমান;
গেছে ফিরে লাজে ক্ষোভে অভিমানে তারা।
তাদের কাঙালপণা অঞ্জলিপ্রসার
জাগাইত ঘৃণা মোর। পণ্যবৃত্তি সম
দান করি বিনিময়ে প্রতিদান চাওয়া
তুলিত বিরূপ করি অন্তর আমার।
তুমি চাহ নাই কিছু দ্বারে এসে মম,
পূর্ণ হল তাই তব অযাচিত পাওয়া।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০৬-)

৯৩ তির্যক

তির্যক সবি, পৃথিবী মানুষ—
প্রাচ্য নৃত্য, কবির ফানুষ
আধো পথে নেমে মিলায় আভাসে
কুটিল রেখায় ভঙ্গুর হাসে।

যুযুৎসু জানে নায়ক-নায়িকা আত্মরত
বিতত বন্ধে কাব্যেরো প্রাণ ওষ্ঠাগত।
বাঁকানো সাঁথিতে সিন্দুর রাঙা
বঙ্কিম ঠোঁটে ফোটে হাসি ভাঙা।
সর্পিল গ্রীবা শ্লেষ-চতুর
মীড়ের মোচড়ে আনে বেসুর।

চোখের কোণেতে তেরছা রঙ্গ
সুদূর চাঁদের শৃঙ্গ-ভঙ্গ।
চিত-চঞ্চরী রমণী নগ্ন,
ফুলডাল হায় কটি-বিলগ্ন!

সবি হেথা সূচীমুখ
ধ্বনি ব্যঞ্জনা আলোচনা আর কবিতা প্রণয়-রীতি
শুধু লাগে অহেতুক
হুল-ফুটানোর মন্তর জানা গৌড়ী রসের প্রীতি।

হুমায়ুন কবির (১৯০৬-)

৯৪ সনেট

১

ক্ষান্ত কর অতীতের পুরাতন গৌরবের কথা।
সে কাহিনী আর বার শুনিবার নাই কোন সাধ।
স্মৃতি তার আজি শুধু চিত্ত ভরি জাগায় তিক্ততা,
ক্রূর কণ্ঠে বর্তমান তারে দেয় অপবাদ।
সুদূর অতীতে যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা
ভুবনে রচিয়া থাকে সভ্যতার নব ইতিহাস,
বঞ্চিত ক্ষুধিত এই দাসত্বের অপমানে ঘেরা
মোদের জীবনে মেলে স্বপ্নেও কি তাহার আভাস?

সে কাহিনী মিথ্যা আজি। মিথ্যা তারে করেছি আমরা।
যে ঐশ্বর্য ছিল সেথা তারে মোরা করিয়াছি ক্ষয়
আমাদের জীবনের দৈন্য দিয়া তীব্র ক্ষুধা দিয়া।
আপন পৌরুষ দিয়া যদি পারি করিবারে জয়
সে গৌরব পুনর্বার, অন্তরের অনলে দহিয়া
রচিব ভারতবর্ষে মানবের স্বপ্নের অমরা।

২

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তার
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।
তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।
চমকি উঠিনু জাগি। তপ্ত নিদাঘের
মূর্ছিত ভুবন ভরি রৌদ্রানল জ্বলে।
স্টেশন-অংগনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধূলির পরে
বসে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের।

অজিত দত্ত (১৯০৭-)

৯৫ যেখানে রূপালি

যেখানে রূপালি ঢেউয়ে দুলিছে ময়ূরপংখী নাও,
যে-দেশে রাজার ছেলে কুমারীরে দেখিছে স্বপনে,
কুঁচের বরণ কন্যা একাকী বসিয়া বাতায়নে
চুল এলায়েছে যেথা—কালো আঁখি সুদূরে উধাও;
যে-দেশে পাষাণ-পুরী, মানুষের চোখের পাতাও

অযুত বৎসরে যেথা নাহি কাঁপে ঈষৎ স্পন্দনে,
হীরার কুসুম ফলে যে-দেশের সোনার কাননে,
কখনো, আমার পরে, তুমি যদি সেই রাজ্যে যাও ঃ
তা'হলে, তোমারে কহি, সে দেশে যে পাশাবতী আছে,
মায়ার পাশাতে যেই জিনে লয় মানুষের প্রাণ,
মোহিনী সে অপরূপ রূপময়ী মায়াবীর কাছে
কহিয়া আমার নাম শুধাইয়ো আমার সন্ধান;
সাবধানে যেয়ো সেথা, চোখে তব মোহ নামে পাছে,
পাছে তা'র মৃদুকণ্ঠে শোনো তুমি অরণ্যের গান।

৯৬ রাঙা সন্ধ্যা

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে' চ'লে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নি পানে দু'টি কথা উড়ে যায়!

পাখার শব্দে কাঁপে হৃদয়ের প্রস্তর-স্তব্ধতা,
দূর হ'তে দূর—তবু কানে বাজে সে পাখার স্পন্দন,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণ, ঝড়ের মতন তবু তা'র মত্ততা।

চলে' যায় তা'রা চোখের আড়ালে—লক্ষ কথার বন
অট্টহাস্যে কোলাহল করে, তবু ভেসে আসে কানে
পাখার ঝাপট; বজ্র ছাপায়ে এ কি অলি-গুঞ্জন ?

যাযাবর যত পক্ষী-মিথুন-থামে তারা কোন্‌খানে ?
মানুষের ছায়া সে আলোর নীচে পড়েছে কি কোনোদিন ?
তুমি তো আমারে ভুলে যাবে নাকো—যদি যাই সন্ধানে ?

তুমি নীড়, তুমি উষ্ণ কোমল; পাখার শব্দ ক্ষীণ,
তবু সে আমারে ডাকে, ডাকে শুধু ছেদহীন, ক্ষমাহীন।

৯৭ একটি কবিতার টুক্‌রো

মালতী, তোমার মন নদীর স্রোতের মত চঞ্চল উদ্দাম;
মালতী, সেখানে আমি আমার স্বাক্ষর রাখিলাম।

জানি, এই পৃথিবীতে কিছুই রহে না;
শুক্লকৃষ্ণ দুই পক্ষ বিস্তারিয়া মহা শূন্যতায়
কাল বিহংগম উড়ে' যায়
অবিশ্রান্ত গতি।
পাখার ঝাপটে তা'র নিবে যায় উল্কার প্রদীপ,
লক্ষ লক্ষ সবিতার জ্যোতি।
আমি সেই বায়ুস্রোতে খ'সে-পড়া পালকের মত
আকাশের শূন্য নীলে মোর কাব্য লিখি অবিরত;
সে-আকাশ তোমার অন্তর,
মালতী. তোমার মনে রাখিয়াছি আমার স্বাক্ষর।

৯৮ মিস্‌—

কলঙ্ক-কঙ্কণ ভাঙো ! ও কেবল ভূষণ তোমার।
বারবার সকলের চোখের উপরে তাই বুঝি
সেই তব কলঙ্কের ঐশ্বর্যের মহামূল্য পুঁজি
ঢঙে আর ন্যাকামিতে নানাভাবে করিছ প্রচার।
দ্রৌপদীর কথা ভাবি' মনে আনিয়ো না অহঙ্কার
উষাকালে তব নাম মানুষ স্মরিবে চোখ বুজি',
দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য তব, রাহুময় তোমার ঠিকুজী,
সেথায় নক্ষত্র নাই অনির্বাণ স্মরণীয় তার।

কলঙ্ক-ভূষণ খোলো ! বহু-প্রেম-গর্ব যদি চাহ—
যদি ভালোবাসিবার শক্তি থাকে, প্রিয়তম মাঝে
দ্যাখো তবে পার্থ-ভীম-যুধিষ্ঠিরে, পঞ্চ পাণ্ডবেরে;
যে-কলঙ্কে লুব্ধ করি' বহু হ'তে বহুতরদেরে
ঊর্ণায় টানিতে চাও—সে-ভূষণ নারীরে না সাজে,—
বিশ্বাস করিতে পারো, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট বিবাহ।

৯৯ সনেট

একবার মনে হয়, দূরে—বহু দূরে-শাল, তাল,
তমাল, হিন্তাল আর পিয়ালের ছায়া ম্লান—দেশে
প্রেম বুঝি নাহি টুটে, অশ্রু বুঝি কোনো দিন এসে
আঁখি হ'তে মুছে নাহি নেয় স্বপ্ন। বুঝি এ-বিশাল
ধরণীর কোনো কোণে ফুল ফুটে রয় চিরকাল,
বসন্ত-সন্ধ্যার মোহ দক্ষিণ বাতাসে আসে ভেসে,
বুঝি সেথা রজনীর পরিতৃপ্ত প্রেমের আবেশে
প্রভাত-পদ্মের ভরে কেঁপে ওঠে তারার মৃণাল।

যদি তাই হয়, তবু সেই দেশে তুমি আর আমি
বাহুতে জড়ায়ে বাহু নাহি যাবো শান্তির সন্ধানে;
মোদের জানালা পথে বয়ে যাক্ পৃথিবীর স্রোত।
সে-স্রোতে কখনও যদি ভেসে আসে নীলাভ-শরৎ,
তোমার চোখের কোলে, মেঘ যদি বড় মোহ আনে,
সে-চোখে আমার পানে চেয়ো তুমি অকস্মাৎ থামি'।

১০০ জিজ্ঞাসা

যদি এই হৃদয়ের রঙটুকু নিয়ে কোনোদিন
বাতাস উদাস হয, আকাশ রঙিন,—
শরতে, কি বসন্তের কুহু-কাকলিতে
নতুন জন্মের স্বাদে দুঃস্বপ্নেরে চায় মুছে দিতে,
তবে কি এ পৃথিবীর ছদ্ম নটীবাস
শাস্ত্র শস্ত্র রাজনীতি বাণিজ্য-বিলাস
সেই মুহূর্তের অভিসারে
প্রাণের নিভৃতে এসে খসে' পড়ে' যাবে একেবারে ?

যদি এই ভেজা মাটি শিশির দূর্বায়,
অনেক বিপথে ঘুরে' পা দু'খানি পথ খুঁজে পায়-

তবে কোনো প্রান্তরের পারে,
কিংবা কোনো ভুলে-যাওয়া নদীর কিনারে,
মানুষের প্রেমের কি সংসারের বিচিত্র কাকলি,
ধূসর পাহাড়ে ঘেরা গ্রাম কিংবা শ্যাম বনস্থলী,
পুরাতন আকাশ কি পুরোনো তারারা,
ধ্যানের শাসন পেয়ে ছাড়া
হবে নত আমার এ হৃদয়ের পুরোনো পুঁথিতে
কোনো এক নতুন কবিতা লিখে দিতে?

আমি সেই মুহূর্তেরে খুঁজে
শহরে, বাজারে, হাটে, মাঠের সবুজে,
কখনো অরণ্যে, কভু রাজধানী-পথে জনতায়,
ঘুরেছি অনেক ক্লান্ত পায়।
রূপকাহিনীর মায়াপুরীতে নিভৃতে,
কত সোনা-ছাওয়া দিনে, কতো হীরে-ছড়ানো রাত্রিতে,
সহস্রের স্রোতে ভেসে, কখনো বা নির্জন সৈকতে,
দ্বীপে ও মরুতে আর কত তীর্থপথে,
কখনো বা মিনারের চূড়ায় দাঁড়ায়ে
দেখেছি দু'চোখে খুঁজে, সম্মুখে পশ্চাতে ডানে বাঁয়ে,
শুধু মনে হয়—
বুঝি সে রয়েছে কাছে, বুঝি কাছে নয়।

হোলো কতদিন!
সকালের রোদ আজ বিকালের ছায়ায় মলিন।
তবু জানি প্রাণের সে চরম জিজ্ঞাসা
আজো করে উত্তরের আশা
আকাশে বাতাসে চাঁদে, কখনো বা মানুষের ঘরে,
পাখীর আওয়াজে আর প্রণয়ের মৃদু কণ্ঠস্বরে।
হয়তো জীবনে কিংবা জীবনেরো বড় কল্পনায়
সে-মুহূর্ত আছে যেন, আছে প্রতীক্ষায়॥

১০১ নইলে

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির ?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির ?
নইলে
রইলে
ট্রাম না চড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

প্র্যাকটিস্ করেছো কি দৌড়ে ?
লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর ভোঁ-উড়ে ?
নইলে
রইলে
লরিতে চাপা,
তাড়া ক'রে বাড়ি থেকে বাড়িয়োনা পা।

দাঁত আছে মজবুত সব বেশ ?
পাথর চিবিয়ে আছে অভ্যেস ?
নইলে
রইলে
ভাত না খেয়ে,
চালে ও কাঁকরে আধাআধি থাকে হে।

স্থির করে পা দুটো ও মনটা,
দাঁড়াতে পারো তো বারো ঘণ্টা ?
নইলে
রইলে
না কিনে ধুতি—
মতোই দোকানে গিয়ে করো কাকুতি।

১০২ জয়ের আগে

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পায়ের নিচে
কত অরণ্য-গিরি-জনপদ গুঁড়ায়ে গেছে,
নিঃসাড় এই প্রেত-পল্লীরও দগ্ধ মাঠে
ফেলিলে চরণ! মহাশ্চর্য কী আর আছে!
প্রণমি তোমারে, দিগ্বিজয়ের রাজ্যভাগ
তোমারি থাকুক, আমরা কেবল ভিক্ষা চাই—
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্ব-খুরে
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই।

সাত সমুদ্র তেরো নদী নখ-মুকুরে বটে,
কূপের বার্তা তত জানাশোনা হয়তো নেই,
পক্ষীরাজের চর্যা যাহার আশৈশব
ভেক-পরিচয় নহেক তাহার আয়ত্তেই।
কাহিনী তোমার ইতিবৃত্তে রক্ষণীয়,
মিনতি মোদের, ভট্টজনেরে ভিক্ষা দিয়ো;
আমাদের শুধু দিয়ো কিঞ্চিৎ চরণ-ছায়া
এবং তোমার দর্শন অতি দর্শনীয়।

রাজার কাহিনী বহু-বিশ্রুত, প্রজার কথা
রাজভট্টের মহাকাব্যেতে ক্কচিৎ-ই মেলে,
রাজ্যশাসনও শুনি লোক মুখে দুরূহ নয়
রাজপুরুষেরা রাজস্বর্গের অংশ পেলে।
তাই অনুরোধ, রাজকন্যার সোহাগ ফাঁকে
অতি অভাজন প্রজাগণ প্রতি করুণা করি'
দিয়ো একবার দর্শন—বহু বিজ্ঞাপিত,
ক্রুর বুভুক্ষা ভুলি যাতে সেই গর্ব স্মরি'।

হে রাজপুত্র, তোমার ঘোড়ার পুচ্ছ ঘেরা
মরকত আর বৈদূর্যের মালার প্রতি
করিবো না লোভ, শপথ তোমার, ঈর্ষাবশে
ভাগ্যে তোমার করিবো না রোষ, দণ্ডপতি !'
বহুপ্রতীক্ষমানা—বাঞ্ছিত হে বীরবর,
অতি দরিদ্র অভাজন মোরা ভিক্ষা চাই,
যুদ্ধের পথ এঁকেছো যেখানে অশ্বখুরে,
জয়োৎসবের পুষ্পসরণি এঁকো সেথাই ॥

সুনীলচন্দ্র সরকার (১৯০৭-)

১০৩ জামতলা

আয় চ'লে এই জামতলায়
দূর থেকে দ্যাখ বাড়িটা তোর
এদিকে জানালা ওদিকে দোর
চলন্ত ছবি ঝলমলায়।
ওদিকে বেরোয় ধোঁয়া আঁকাবাঁকা
আকাশের রোদে ফণা-তুলে-রাখা;
মেঝে ঘণ্টানি, জলের আওয়াজ,
ঘর থেকে ঘরে ঘুরে ফেরে কাজ;
বিছানা বসন বাসন বাধ্য,
তাড়ার ধমকে এগোয় খাদ্য;
পতপত ভিজে কাপড় উড়ছে
জানালার নীচে বেরাল ঘুরছে;
'গামছা কোথায়, ঘটিটা মাজ না'—
বাজে বিচিত্র সুরের বাজনা।
দ্যাখ ব'সে এই জামতলায়
কেমন খেলনা বাড়িটা তোর,
দপদপ্ করে জানালা দোর
মানুষ বাঁচার ঢেউতলায়।
ছবির মতন লাগে মধুর
বাইরে এখানে জামতলায়

মনের বাঁধুনি এলিয়ে যায়
শীতল ছাওয়ায় উদাস সুর।
বাড়িতে ফিরলে এলাকা ঘড়ির,
খুচরো চলন পয়সা-কড়ির,
খুঁটিনাটি আর এটাতে ওটাতে
পুরোণো অভাব নতুন মেটাতে,
কখনো রঙ্গে দমকা মেজাজে
কখনো কথায় এ-কাজে সে-কাজে
জুতোয় জামায় সেঁধিয়ে পেরিয়ে
সময়ের গাঁট অনেক পেরিয়ে
ফের মশারিতে যবনিকাপাত
চোখে জল দিয়ে আবার প্রভাত।
বাইরে এখানে জামছায়ায়
ঘটে না কিছুই সারা দুপুর।
এ শুধু সময়বহার সুর।
মনে বাঁধুনি এলিয়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-)

১০৪ বন্দীর বন্দনা

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি' রেচেছো আমায়—
নির্ম্মম নির্ম্মাতা মম ! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার !
মনে করি, মুক্ত হবো ; মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।
রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত
স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চ'লে যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত ; দাসত্বের স্নেহের সন্তান
সংস্কারের বুকে হানি তীব্র তীক্ষ্ণ রূঢ় পরিহাস,
অবজ্ঞার কঠোর ভর্ৎসনা।

মনে ভাবি, মুক্তি বুঝি কাছে এলো—
বিশ্বের আকাশে বহে লাবণ্যের মৃত্যুহীন স্রোত।

তারপরে একদিন অকস্মাৎ বিস্ময়ে নেহারি—
কোথা মুক্তি ?
সহস্র অদৃশ্য বাধা নিশিদিন ঘি'র আছে মোরে,
যতই এড়ায়ে চলি, ততই জড়ায়ে ধরে পায়ে,
রোধ করে জীবনের গতি।
সে-বন্ধন চলে মোর সাথে-সাথে জীবনের নিত্য অভিসারে
সুন্দরের মন্দিরের পানে।
সে-বন্ধন মগ্ন করি' রেখেছে আমারে
আকণ্ঠ পঙ্কের মাঝে।
সে-বন্ধন লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছনার বীজাণুতে
কলুষিত করিয়াছে নিশ্বাসের বাতাস আমার—
লোহিত শোণিত মম নীল হ'য়ে গেছে সে-বন্ধনে।
ক্ষণ-তরে নাহি মুক্তি; কর্ম্ম-মাঝে, মর্ম্ম-মাঝে মোর,
প্রতি স্বপ্নে, প্রতি জাগরণে,
প্রতি দিবসের লক্ষ্য বাসনা-আশায়
আমারে রেখেছো বেঁধে অভিশপ্ত, তপ্ত নাগপাশে
সৃজন-উষার আদি হ'তে—
উদাসীন স্রষ্টা মোর !
মুক্তি শুধু মরীচিকা—সুমধুর মিথ্যার স্বপন,
আপনার কাছে মোরে করিয়াছো বন্দী চিরন্তন।

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দ্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয়-ভিক্ষা মাগে নিতি;—
তাদের মেটাতে হয় আত্ম-বঞ্চনার নিত্য ক্ষোভ।
আছে ক্রুর স্বার্থদৃষ্টি, আছে মূঢ় স্বার্থপর লোভ,

হিরন্ময় প্রেমপাত্রে হীন হিংসা-সর্প গুপ্ত আছে।
আনন্দনন্দিত দেহে কামনার কুৎসিত দংশন,
জিঘাংসার কুটিল কুশ্রীতা।
সুন্দরের ধ্যান মোর এরা সব ক্ষণে-ক্ষণে ভেঙে দিয়ে যায়,
কাঁদায় আমারে সদা অপমানে ব্যথায়, লজ্জায়।
ভুলিয়া থাকিতে চাই;—ক্ষণ-তরে ভুলে যাই ডুবে গিয়ে
লাবণ্য উচ্ছ্বাসে—
তবু, হায়, পারিনে ভুলিতে।
নিমেষে-নিমেষে ত্রুটি, পদে-পদে স্খলন-পতন,
আপনারে ভুলে যাওয়া—সুন্দরের নিত্য অসম্মান।
বিশ্বস্রষ্টা, তুমি মোরে গড়েছো অক্ষম করি' যদি,
মোরে ক্ষমা করি' তব অপরাধ করিয়ো ক্ষালন।

জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হ'তে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গলোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়,
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি ঃ
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চিরসুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।

বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।
না-হয় ডুবিয়া আছি কৃমিঘন পঙ্কের সাগরে,
গোপন অন্তর মম নিরন্তর সুধার তৃষ্ণায়
শুষ্ক হ'য়ে আছে তব।
না-হয় রেখেছো বেঁধে ; তবু জেনো, শৃঙ্খলিত ক্ষুদ্র হস্ত মোর
উধাও আগ্রহভরে ঊর্ধ্বনভে উঠিবারে চায়
অসীমের নীলিমারে জড়াইতে ব্যগ্র আলিঙ্গনে।
মোর আঁখি রহে জাগি' নিস্তব্ধ নিশীথে,

আপন আসন পাতে নিদ্রাহীন নক্ষত্রসভায়,
স্বচ্ছ শুভ্র ছায়াপথে মায়ারথে ভ্রমি' ফেরে কভু
আবেশ-বিভ্রমে।
তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমা-রাত্রি-সম,
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।
তাই মোর দেহ যবে ভিক্ষুকের মতো ঘুরে মরে
ক্ষুধাজীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কাল—
সমস্ত অন্তর মম সে-মুহূর্তে গেয়ে ওঠে গান।
অনন্তের চির-বার্তা নিয়া ;
সে কেবল বার-বার অসীমের কানে-কানে একটি গোপন বাণী কহে-
'তবু আমি ভালোবাসি, তবু আমি ভালোবাসি আজি !'
রক্তমাঝে মদ্যফেনা, সেথা মীনকেতনের উড়িছে কেতন,
শিরায়-শিরায় শত সরীসৃপ তোলে শিহরণ,
লোলুপ লালসা করে অন্যমনে রসনালেহন।
তবু আমি অমৃতাভিলাষী !—
অমৃতের অন্বেষণে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি,
ভালোবাসি—আর-কিছু নয়।
তুমি যারে সৃজিয়াছো, ওগো শিল্পী, সে তো নহি আমি,
সে তোমার দুঃস্বপ্ন দারুণ।
বিশ্বের মাধুর্য-রস তিলে-তিলে করিয়া চয়ন
আমারে রচেছি আমি ;—তুমি কোথা ছিলে অচেতন
সে মহাসৃজন-কালে—তুমি শুধু জানো সেই কথা।

মোর আপনারে আমি নবজন্ম করিয়াছি দান।
নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আজি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।
মোর এই নব সৃষ্টি—এ যে মূর্ত বন্দনা তোমার,
অনাদির মিলিত সংগীত।
আমি কবি, এ-সংগীত রচিয়াছি উদ্দীপ্ত উল্লাসে,
এই গর্ব মোর—
তোমার ত্রুটিরে আমি আপন সাধনা দিয়া করেছি শোধন,

এই গর্ব মোর।
লাঞ্ছিত এ-বন্দী তাই বন্ধহীন আনন্দ-উচ্ছ্বাসে
বন্দনার ছদ্মনামে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ গেলো হানি'
তোমার সকাশে।

১০৫ শেষের রাত্রি

পৃথিবীর শেষ সীমা যেইখানে, চারিদিকে খালি আকাশ ফাঁকা,
আকাশের মুখে ঘুরে-ঘুরে যায় হাজার-হাজার তারার চাকা,
যোজনের পরে হাজার যোজন বিশাল আঁধারে পৃথিবী ঢাকা।
(তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার ;
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

বিশাল আকাশ বাসনার মতো পৃথিবীর মুখে এসেছে নেমে,
ক্লান্ত শিশুর মতন ঘুমায় ক্লান্ত সময় সহসা থেমে ;
দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে ধূসর পৃথিবী করিছে খাঁ-খাঁ।
(আমারি প্রেমের মতন গহন অন্ধকার ;
প্রেমের অসীম বাসনার মতো অন্ধকার ;
তবু চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

নেমেছে হাজার আঁধার রজনী, তিমির তোরণে চাঁদের চূড়া,
হাজার চাঁদের চূড়া ভেঙে-ভেঙে হয়েছে ধূসর স্মৃতির গুঁড়া।
চলো চিরকাল জ্বলে যেথা চাঁদ, চির-আঁধারের আড়ালে বাঁকা।
(তোমারি চুলের বন্যার মতো অন্ধকার।
তোমারি চোখের বাসনার মতো অন্ধকার।
তবু চ'লে এসো, মোর হাতে হাত দাও তোমার,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

এসেছিলো যত রূপকথা-রাত ঝরেছে হলদে পাতার মতো,
পাতার মতন পীত স্মৃতিগুলি যেন এলোমেলো প্রেতের মতো।
—রাতের আঁধারে সাপের মতন আকাবাঁকা কত কুটিল শাখা।
(এসো চ'লে এসো ; সেখানে সময় সীমানাহীন,
হঠাৎ-ব্যথায় নয় দ্বিখণ্ড রাত্রিদিন ;
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন,
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

অনেক ধূসর স্মরণের ভারে এখানে জীবন ধূসরতম,
ঢালো উজ্জ্বল বিশাল বন্যা তীব্র তোমার কেশের তমো,
আদিম রাতের বেণীতে জড়ানো মরণের মতো এ-আঁকাবাঁকা।
(ঝড় তুলে দাও, জাগাও হাওয়ার ভরা জোয়ার,
পৃথিবী ছাড়ায়ে, সময় মাড়ায়ে যাবো এবার,
তোমার চুলের ঝড়ের আমরা ঘোড়সওয়ার—
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

যেখানে জ্বলিছে আঁধার-জোয়ারে জোনাকির মতো তারকা-কণা,
হাজার চাঁদের পরিক্রমণে দিগন্ত ভ'রে উন্মাদনা।
কোটি সূর্যের জ্যোতির নৃত্যে আহত সময় ঝাপটে পাখা।
(কোটি-কোটি মৃত সূর্যের মতো অন্ধকার,
তোমার আমার সময়-ছিন্ন বিরহ-ভার ;
এসো চ'লে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

তোমার চুলের মনোহীন তমো আকাশে-আকাশে চলেছে উড়ে
আদিম রাতের আঁধার-বেণীতে জড়ানো মরণ-পুঞ্জে ফুঁড়ে,—
সময় ছাড়ায়ে, মরণ মাড়ায়ে—বিদ্যুৎময় দীপ্ত ফাঁকা।
(এসো চ'লে এসো, যেখানে সময় সীমানাহীন,
সময়-ছিন্ন বিরহে কাঁপে না রাত্রিদিন।
সেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন
কঙ্কা, শঙ্কা কোরো না।)

১০৬ চিল্কায় সকাল

কী ভালো আমার লাগলো আজ এই সকালবেলায়
কেমন ক'রে বলি।

কী নির্মল নীল এই আকাশ, কী অসহ্য সুন্দর,
যেন গুণীর কণ্ঠের অবাধ উন্মুক্ত তান
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঃ

কী ভালো আমার লাগলো এই আকাশের দিকে তাকিয়ে;
চারদিক সবুজ পাহাড়ে আঁকাবাঁকা, কুয়াশায় ধোঁয়াটে,
মাঝখানে চিল্কা উঠছে ঝিলকিয়ে।

তুমি কাছে এলে, একটু বসলে, তারপর গেলে ওদিকে,
ইস্টেশনে গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে, তা-ই দেখতে।
গাড়ি চ'লে গেলো।—কী ভালো তোমাকে বাসি,
কেমন ক'রে বলি।

আকাশে সূর্যের বন্যা, তাকানো যায় না।
গোরুগুলো একমনে ঘাস ছিঁড়ছে, কী শান্ত !
—তুমি কি কখনো ভেবেছিলে এই হ্রদের ধারে এসে
আমরা পাবো
যা এতদিন পাইনি।

রুপোলি জল শুয়ে-শুয়ে স্বপ্ন দেখছে, সমস্ত আকাশ
নীলের স্রোতে ঝ'রে পড়ছে তার বুকের উপর
সূর্যের চুম্বনে।—এখানে জ্ব'লে উঠবে অপরূপ ইন্দ্রধনু
তোমার আর আমার রক্তের সমুদ্রকে ঘিরে
কখনো কি ভেবেছিলে ?

কাল চিল্কায় নৌকোয় যেতে-যেতে আমরা দেখেছিলাম
দুটো প্রজাপতি কত দূর থেকে উড়ে আসছে
জলের উপর দিয়ে।—কী দুঃসাহস! তুমি হেসেছিলে, আর আমার
কী ভালো লেগেছিলো

তোমার সেই উজ্জ্বল অপরূপ সুখ। দ্যাখো, দ্যাখো,
কেমন নীল এই আকাশ।—আর তোমার চোখে
কাঁপছে কত আকাশ, কত মৃত্যু, কত নতুন জন্ম
কেমন ক'রে বলি।

১০৭ দর্শন দুর্গম অতি

সমর সেন

স্মরণীয়েষু

দর্শন দুর্গম অতি, রাজনীতি কর্কশ জটিল,
ক্লান্ত প্রাণ ঘুরে মরে বিতর্কের গোলকধাঁধায়,
মীমাংসার স্বর্ণমৃগ সন্ধানীরে নিত্যই কাঁদায়,
প্রতি পক্ষে পিত্তজ্বলে, সত্তার কপাটে পড়ে খিল।
আমাকে ফিরায়ে নাও অজ্ঞতার মত্ততায়, নীল,
নীল স্তব্ধতার অন্ধকারে, যেখানে বিশ্বের দায়
জ্বালায় ধ্যানের শিখা।—দাও সেই বুদ্ধিরে বিদায়
কৈলাসেরে লক্ষ্য ক'রে যে-দাম্ভিক ছোঁড়ে শুধু ঢিল।

বিতর্ক-বিরক্ত মন দ্বিখণ্ডিত দর্পণের মতো
বিড়ম্বিত প্রতিবিম্বে রাষ্ট্র করে বিশ্বের বিকৃতি,
পরস্পরে হত্যা করে প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তির সেনানী।
আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিত্বের অদ্বিতীয়-ব্রত,
সংঘহীন, সংজ্ঞাতীত এককের আদিম জ্যামিতি—
স্তব্ধতার নীলিমায় আত্মজাত পূর্ণতার বাণী।

১০৮ ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা

ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা,
শেষ তব শীর্ণ ছায়া শুষে নিলো আজ
শুভ্র সভ্যতার সূর্য।
করো, জয়ধ্বনি করো,
ছিন্ন হ'লো ঘন অন্ধকার
মেঘবর্ণ মেখলা লুণ্ঠিত—
ঐ এলো প্রেমিক বণিক-বীর
তব নগ্ন কৌমার্যেরে ত্বরিতে করিতে
সভ্যতাসন্তানবতী
দীর্ণ তব হৃৎপিণ্ডের রক্তের যৌতুকে।

হে আফ্রিকা, হও গর্ভবতী।
আনো আনো বাণিজ্যের জারজেরে
দ্রুত তব অংকতলে।
পূর্ণ হোক কাল।
স্থূলোদর লোলজিহ্ব লোভ
রক্তস্ফীত বাণিজ্যের বীজ
হোক পূর্ণ হোক।
করো,
বিকলাঙ্গ, পক্ষাঘাত-পঙ্গু, নপুংসক বিকৃত জাতক,
তার জয়ধ্বনি করো।
উন্মত্ত কামার্ত ক্লীব, আত্মরক্ষা আত্মহত্যা তার।

হে আফ্রিকা,
অবসন্ন বণিকবৃত্তির নিহিত মৃত্যুর 'পরে
বিদ্যুৎ-চমকে
কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে।
হে আফ্রিকা, হে গণিকা-মহাদেশ,

একদিন তব দীর্ণ বিষুবরেখায়
শতাব্দীর পুঞ্জ-পুঞ্জ অন্ধকার
উদ্দীপিত হবে তীব্র প্রসব-ব্যথায়।
করো,
মৃত্যুরে মন্থন করি' নবজন্ম কাঁপে থরোথরো,
জয়ধ্বনি করো।

১০৯ ব্যাং

বর্ষায় ব্যাঙের ফুর্তি। বৃষ্টি শেষ, আকাশ নির্বাক;
উচ্চকিত ঐক্যতানে শোনা গেলো ব্যাঙেদের ডাক।

আদিম উল্লাসে বাজে উন্মুক্ত কণ্ঠের উচ্চ সুর।
আজ কোনো ভয় নেই—বিচ্ছেদের, ক্ষুধার, মৃত্যুর।

ঘাস হ'লো ঘন মেঘ; স্বচ্ছ জল জ'মে আছে মাঠে।
উদ্ধত আনন্দগানে উৎসবের দ্বিপ্রহর কাটে।

স্পর্শময় বর্ষা এলো; কী মসৃণ তরুণ কর্দম!
স্ফীতকণ্ঠ, বীতস্কন্ধ—সংগীতের শরীরী সপ্তম।

আহা কী চিক্কণ কান্তি মেঘস্নিগ্ধ হলুদে-সবুজে!
কাচ-স্বচ্ছ ঊর্ধ্বদৃষ্টি চক্ষু যেন ঈশ্বরেরে খোঁজে

ধ্যানমগ্ন ঋষি-সম। বৃষ্টি শেষ, বেলা প'ড়ে আসে;
গম্ভীর বন্দনাগান বেজে ওঠে স্তম্ভিত আকাশে।

উচ্চকিত উচ্চসুর ক্ষীণ হ'লো; দিন মরে ধুঁকে;
অন্ধকার শতছিদ্র একছন্দা তন্দ্রা-আনা ডাকে।

মধ্যরাত্রে রুদ্ধদ্বার আমরা আরামে শয্যাশায়ী
স্তব্ধ পৃথিবীতে শুধু শোনা যায় একাকী উৎসাহী

একটি অক্লান্ত সুর; নিগূঢ় মন্ত্রের শেষ শ্লোক—
নিঃসঙ্গ ব্যাঙের কণ্ঠে উৎসারিত—ক্রোক, ক্রোক, ক্রোক।

১১০ রূপান্তর

দিন মোর কর্মের প্রহারে পাংশু,
রাত্রি মোর জ্বলন্ত জাগ্রত স্বপ্নে।
ধাতুর সংঘর্ষে জাগো, হে সুন্দর, শুভ্র অগ্নিশিখা,
বস্তুপুঞ্জ বায়ু হোক, চাঁদ হোক নারী,
মৃত্তিকার ফুল হোক আকাশের তারা।
জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়,
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।
দেহ হোক মন, মন হোক প্রাণ, প্রাণে হোক মৃত্যুর সংগম,
মৃত্যু হোক দেহ, প্রাণ, মন।

১১১ প্রত্যহের ভার

যে-বাণীবিহঙ্গে আমি আনন্দে করেছি অভ্যর্থনা
ছন্দের সুন্দর নীড়ে বার-বার, কখনো ব্যর্থ না
হোক তার বেগচ্যুত পক্ষমুক্ত বায়ুর কম্পন
জীবনের জটিল গ্রন্থিল বুকে ; যে-ছন্দোবন্ধন
দিয়েছি ভাষারে, তার অন্তত আভাস যেন থাকে
বৎসরের আবর্তনে, অদৃষ্টের ক্রূর বাঁকে-বাঁকে,
কুটিল ক্লান্তিতে; যদি ক্লান্তি আসে, যদি শান্তি যায়,
যদি হৃৎপিণ্ড শুধু হতাশায় ডম্বরু বাজায়,

রক্ত শোনে মৃত্যুর মৃদঙ্গ শুধু;—তবুও মনের
চরম চূড়ায় থাক সে-অমর্ত্য অতিথি-ক্ষণের
চিহ্ন, যে-মুহূর্তে বাণীর আত্মারে জেনেছি আপন
সত্তা ব'লে, স্তব্ধ মেনেছি কালেরে, মূঢ় প্রবচন
মরণে; যখন মন অনিচ্ছার অবশ্য-বাঁচার
তুলেছে ভীষণ ভার, ভুলে গেছে প্রত্যহের ভার।

১১২ অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন ! কোথায় কামরূপ !
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই ?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা ?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
দ্যাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তায় অসম্ভবে!

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,
সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

ফসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর, ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?
—আবার বসন্তের হুলুস্থূল।

আবার বসন্তের হুলুস্থূল।
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী!
থামে না চ্যাঁচামেচি! যদি অসম্ভব,
তবে এ-হুঙ্কার কোথায় মূল?

১১৩ রাত্রি

রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা দিয়ো না।

তোমার মনে আছে, রাত্রি, আমাদের মিলনের অনুষ্ঠান? সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ, আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত, আগুনের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ, জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্রমধুর উন্মাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ, আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ।

দিন, তোমার বোন, তোমার সতিন, সে তার কাঁকন-পরা মোটা হাতে বাধ্য করেছে আমাকে, নিয়ে গেছে টেনে তার অলিতে-গলিতে, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা বাজিয়ে-বাজিয়ে। ব্যস্ত সে, অঢেল রৌদ্র নিয়েও অস্পষ্ট; এলোমেলো, ছেঁড়াখোঁড়া, আকৃতিহীন; তার মুহূর্তগুলি শিষের মতো বোবা শব্দে ফুটপাতে খ'সে পড়ে, তার ঘণ্টার টুকরোগুলোকে জোড়া দিয় আর-কিছুই পাওয়া যায় না—শুধু খিদে পাওয়ার দীনতা, খেতে পাওয়ার হীনতা, শুধু ইতর সুখ, বামন দুঃখ।

এই দিন আমি মেনে নিয়েছি, সহ্য করেছি, বকলশ-আঁটা কুকুরের মতো ঘুরেছি তার পিছনে—তোমার জন্য, তোমারই জন্য, রাত্রি! আ, সেই মুহূর্তে, যখন, দিনের মুঠো শিথিল, রাবণ ভিড় নিবৃত্ত, আমি আবার খুঁজে পেয়েছি তোমাকে, নগ্ন হ'য়ে, শুদ্ধ হ'য়ে, তোমার কালো চুলের অতল নীল তরঙ্গে-তরঙ্গে স্নান ক'রে বলতে পেরেছি—'আমি আছি!'

তুমি আমাকে দিয়েছো তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ—ম'রে-যাওয়া, ফিরে-আসা চাঁদ, আর নক্ষত্রের নিশ্বাস-ফেলা অন্ধকার! আর আমি তোমাকে দিয়েছি আমার প্রাণ, আমার মন, আমার চেতন সত্তা নিংড়ে-নিংড়ে পূর্ণ করেছি চুম্বনের পাত্র।

মনে আছে?

আমি খেলা করেছি তোমার চাঁদ নিয়ে, যেমন শুয়ে-শুয়ে কানের দুলের মুক্তো গোনে প্রেমিক, তোমার বাঁকা চাঁদ, রোগা,

ঝোলা, চ্যাপ্টা চাঁদ, শাদা, সবুজ, হলুদ, উর্বশীর রূপের মতো নির্লজ্জ, ভাঙা কাচের দাঁতের মতো শীতের চাঁদ, ঈশ্বরের ক্ষমার মতো দিগন্তে। দুই হাতে ছেনেছি তোমার অন্ধকার, উঠেছি তার ধাপে-ধাপে বেয়ে, নেমেছি তার আনন্দময় ঢালু দিয়ে গড়িয়ে, তার নরম, রোমশ, অফুরন্ত ভাঁজে-ভাঁজে জড়িয়ে গিয়েছি, তোমার বিশাল, তরল আলিঙ্গনে লীন হ'তে-হ'তে বুঝেছি যে নক্ষত্রেরা আর কিছু-নয়, তামসীর চিন্ময় রূপ—যখনই তুমি চিন্তা করো, তখনই আকাশে তারা ফোটে, মনস্বিনী!

আর আমিও চেয়েছি আমার চিন্তা আলো হ'য়ে ফুটুক, তারা হ'য়ে জ্বলুক, শাদা, সবুজ, সোনালি তারা, বরফের চোখের মতো ধারালো, দেবতার অশ্রুর মতো দিগন্তে। আর যখন, তোমার সেই পূর্ণতার প্রহরে, যখন কবি, দুঃখী, চোর ছাড়া আর-কেউ জেগে থাকে না, আমার আশার অশ্ববেগ আমাকেই মাড়িয়ে গেছে খুরের তলায়, তখন তোমার ফুলে-ফুলে-ওঠা বুকের মধ্যে থরথর ক'রে কেঁপেছি আমি, বলেছি তোমার কানে-কানে আমার আকুল দুঃখ, পাগল বাসনা, বাসনার ব্যর্থতা—তোমারই কানে-কানে, প্রিয়তমা!

তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাওনি—হীন সান্ত্বনা দাওনি; শুধু তোমার গুঞ্জনময় স্তব্ধতার সুরে বলেছো, 'এই নাও, এই বিশাল দেশ, বিশাল নির্জন, একে জনতাকীর্ণ ক'রে তোলো তোমার রক্ত দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে!'

আমার বাসনা, আমার পরাজয়, আমার দুঃখের ঐশ্বর্য, তার বদলে এই তুমি দিয়েছো আমাকে—এই সবীজ দেশ, নির্জন দেশ আর অনিদ্রার উন্মাদনা।

সব ভুলে গেছো?

না, না, আমি জানি তোমাকে, ছলনাময়ী, তুমি অসতী হ'য়ে জাগিয়ে দিলে আমার পৌরুষ, আমাকে পরিত্যাগ ক'রে জ্বালিয়ে দিলে তৃষ্ণা। একদিন তুমি নিজেই ধরা দিয়েছিলে আমাকে, আজ তোমার এই পণ যে আমি তোমাকে জয় করবো, রাক্ষসী মৃত্যুকে মেরে জয় ক'রে নেবো তোমাকে, অজরা। আর যেহেতু আমার কথা ছাড়া অস্ত্র নেই, গান ছাড়া সৈন্য নেই, তাই কথার

ইস্পাতে শান দিয়ে-দিয়ে এই গান আজ বানালাম—ফিরে এসো, রাত্রি, নেমে এসো এই মৃত্যুর উপর, আনো তোমার বুক ভ'রে আমার যন্ত্রণা—স্বপ্ন দাও, দুঃস্বপ্ন দাও, দাও ঈশ্বরের মতো কবির নিঃসঙ্গতা, কিংবা জ্বরের প্রলাপের আনন্দ—তোমার চিরযৌবনের যে-কোনো একটি চিহ্ন দাও আমাকে—শুধু নিদ্রা দিয়ো না, নিদ্রা দিয়ো না। আমাকে বাঁচতে দাও তোমার মধ্যে, তোমার নীল, কুটিল শিরায়-শিরায় আমি যেন ছড়িয়ে যাই আকাশ ভ'রে, তোমার চাঁদের ভাঙা-গড়ার স্পর্শ নিয়ে রঙিন হ'য়ে উঠি, স্পন্দিত হই নক্ষত্রের নিশ্বাসে;—আর যখন, আমাদের প্রণয়ের তাপ সইতে না-পেরে হিংসুক দিন দিগন্তকে ডিমের মতো ফাটিয়ে দেয়, তখন তোমার বুজে-আসা চোখের—তোমারই রহস্যের অপরিমাণ উজ্জ্বল ভারে বুজে-আসা চোখের—সর্বশেষ পলকপাতে আমি যেন চিরন্তনকে পান করতে পারি—এক মুহূর্তে, নিঃশেষে।

নিশিকান্ত (১৯০৯-)

১১৪ পণ্ডিচেরীর ঈশাণকোণের প্রান্তর

কোন
সঙ্গোপন
থেকে এল, এই উজ্জ্বল
শ্যামল
বিন্দুর শিখা !
এই পাষাণখণ্ড-কণ্টকিত
শুষ্ক রুধির-সঞ্চিত
প্রাণহীন রক্তবর্ণ মৃত্তিকা
কার স্পর্শে পেয়েছে প্রাণ ?
অমৃত-সিঞ্চিত বন-মঞ্জরীর অবদান
কোন অদৃশ্য সৌন্দর্যের উৎস থেকে উৎসারিত—
এই গরল-কুণ্ডলিত

ভুজঙ্গ-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে
প্রস্ফুটিত মাধুরীর তরঙ্গে !
যোজনের পর
যোজন বিস্তৃত প্রান্তর ;
আজ সকাল বেলা
এসেছি এখানে। দূরে দূরে দেখা যায় রুক্ষ মাটির স্তূপের মেলা,
তারি উপর দন্ডের মত দাঁড়ানো জমাটবাঁধা পাথর কুচির চাঙড়া,
যেন ক্ষিপ্ত মুণ্ড
নাসাখড়্গধারী গণ্ডার, যেন উদ্যত শুণ্ড
মদ-মত্ত মাতঙ্গের মত।
রাক্ষসী মেদিনী অবিরত
বৎসরে বৎসরে
নিজেই নিজেকে গ্রাস ক'রে ক'রে
সৃষ্টি ক'রেছে এই আরক্তদশন
বুবুক্ষার গহ্বর প্রাঙ্গণ।
বক্ষে তার
বালু-কঙ্করের বঙ্কিত পন্থার
কঙ্কাল।
তারি একপাশে ভস্ম-তাল
শ্মশান ; প'ড়ে আছে দগ্ধ-শেষ চিতার
নিরুত্তাপ পাংশু অঙ্গার,
জীর্ণ মলিন বিক্ষিপ্ত কন্থার
রাশি, ভগ্ন কলসের কানা,
নর-কপালের করোটী, শকুনির নখর-চিহ্ন, শব-লুব্ধ সংগ্রামে
পরাজিত মৃত বায়সের বিচ্ছিন্ন ডানা ;
বসে আছে অপরাজেয়
লোলুপ দৃষ্টির অধিকারী কৃষ্ণকায় সারমেয়।
তবু সেখানে সর্বজয়ী জীবনের
বিকাশের
লিখা
এনেছে দুর্লভ তৃণ-মঞ্জরী, বিন্দু বিন্দু সবুজ গুল্ম-শিখা!--

আর
দুর্দম দুর্বার
মর্ত্য-বিদ্রোহী তাল-বিটপীর বৃন্দ ; তাদের
অটল স্বরূপের
অভিযান তুলেছে উর্ধ্বের
উদ্দেশে, যেন সহস্রশির
বাসুকীর
শত শত ফণা রসাতল ভেদ ক'রে
উঠেছে দুলে অনন্ত অম্বরে,
তারা
পান করে হেন সেই সুনীল সুধার অক্ষর-ধারা ;

যেন কোন খেয়ালী চিত্রকর, আষাঢ়ের
ঘনীভূত মেঘের
রঙের পাত্র শূন্য ক'রে নিয়ে
ধূম-কেতুর পুচ্ছের মত বিশাল তুলি দিয়ে
ঐ অভ্রংলিহ রেখার সারি করেছে অঙ্কিত,
তারি চূড়ায়
শাখায় শাখায়
করেছে তরঙ্গিত
হরিম্বর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ তীক্ষ্ণ-ধার
পাতার
ত্রিকোণ মণ্ডলিকাছন্দের নীহারিকাপুঞ্জ ; সেখানে বিষাণ
বাজায় বাতাস, দোলে বিজয় নিশান ;
তাদের
সর্বঅঙ্গে পুরু ইস্পাতের
চক্রাকার আবর্তনের
কালজয়ী আবরণ ;
নল-কূপের মত তাদের মূল—
এই উবরাপিণ্ডপৃথুল
পৃথিবীর জঠরের অতল-তলে
পলে পলে

করেছে সঞ্চিত
মর্ত্য শ্মশান-মন্থিত
অমৃত।
হে সম্রাট শিল্পী, সুন্দর! কোন অচিন্ত্য লোকের
রহস্যের
বেদিকায় ব'সে আছ তুমি?
এই মরু-বাস্তব ভূমি
তোমার
নিমগ্ন কল্পনার
নির্লিপ্ত আনন্দের
পরম-বস্তু-রসের
রঞ্জনে রঞ্জিত হয়।
জ্যোতির্ময়!
দাও দীক্ষা, অপূর্ব রূপান্তর সাধনের মন্ত্র দাও আমায়;
যে মন্ত্রের শক্তিতে সত্তায়
বিলুপ্ত হবে মেদিনীর
মাতঙ্গ প্রকৃতির
মদমত্ত অভিযান, রাক্ষসী কামনার
বুভুক্ষার
বিক্ষুব্ধ আসক্তি;
জীবনের অভিব্যক্তি
হবে মূর্ত, ঐ বিরাট তাল-বিটপীর নীলাম্বরচুম্বিত
আত্মার মত বর্তিকা,
জ্বলবে অন্তরে
ঐ ওজস্বান তৃণ-শিখার অঙ্কুরে।
দাও তোমার বর্ণমন্দাকিনীর লাবণ্যধারা-নির্ঝরিত তুলিকা,
স্পর্শে যার
দীর্ণ ক'রে আমার
কঠিন প্রাণ-খণ্ডের শিলা
মুঞ্জরিত হবে তোমার
অমর্ত্য-মালঞ্চের
মাধুর্য মন্দারের
সৌন্দর্য লীলা।

১১৫ মহামায়া

সম্মুখে প্রাচীরে ফাটলের বুকে আঁকা
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহারে ডাকে !
তারি দক্ষিণে দোলে অশথ শাখা
প্যাংশুল পাখী সেথায় বসিয়া থাকে।
কৃষ্ণ মেঘের মহিষমুণ্ডটিরে
কে বসাল নীল আকাশের বুক চিরে !
দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি
দাঁড়ায়েছে তাল-তরু;
সাড়ে-তিনগজ ধূসর ভূমিতে
বিশাল সাহারা মরু।

নেভে আর জ্বলে জোনাকি যোনির শিখা,
মসীর সাগরে বহ্নির বুদবুদ !
অট্ট হাসিছে রাতের অট্টালিকা,
দ্বারে বাতায়নে বর্তিকাবিদ্যুৎ।
শাদা আগুনের তরণীতে চাঁদ চলে,
তারার রূপালি তীরের ফলক ঝলে ;
চাহে মার্জার চক্ষু মেলিয়া
মূষিক-বিবর পাশে,
দৃষ্টিতে তার তিমির-দীর্ণ
সূর্য হীরক হাসে।

ওঠে গম্ভীর অম্বুধি গর্জন,
ভাসে অসংখ্য তরঙ্গ সংঘাত ;
খর্জুরশাখে ঝিল্লির প্রস্বন ;
সহসা বিধবা করিল আর্তনাদ !
নবজাত শিশু হেসে ওঠে খল-খল ;

শ্মশান যাত্রী করে ওই কোলাহল ;
লৌহদশনে হুঙ্কার করে
দানব যন্ত্রযান ;
বাতাসে ভরিল শেফালি-ঝরার
মৃদু মঙ্গল তান।

সহসা ঊর্ধ্বে উঠিল রংমশাল
অভ্র ভেদিল মুহূর্তে গতি তার ;
উল্কার শিখা তারি সাথে দিলো তাল
উৎসের গতি লভিল সে অধিকার ;
বৃষভ যানের চাকার কেন্দ্র পাশে
তারি আবর্ত ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আসে,
সে-গতির বেগে বীজের বক্ষ
অংকুরি টুটিয়াছে ;
হিমাদ্রি শির তাহারি মন্ত্র
জপি' নভে উঠিয়াছে।

সকল মূর্তি মূর্তিল কার মাঝে
সারমেয়মুখী ডাকিনী কাহার মায়া !
কার বহ্নিতে সবার বহ্নি বাজে,
শশাঙ্কে কার শুভ্র শিখার কায়া !
কোন্ সে নীরব ধাত্রীর কোলে
জলধি ও শিশু তরঙ্গ তোলে ;
সৃষ্টির গতি-উৎসকে আনে,
কে তারে ধরিয়া রাখে।
অসংখ্য নামে নামখানি কার
ওঙ্কার সম থাকে।

বিষ্ণু দে (১৯০৯-)

১১৬ টপ্পা-ঠুংরি

তোমার পোস্টকার্ড এল,
যেন ছড়টানা স্রোতে
পিৎসিকাটোর আকস্মিক ঘূর্ণী,
রেডিওর ঐক্যতানে বিস্মিত আবেগ।
দিন কাট্‌ল
যেন ভিলম্বিত্‌ হাবিলম্বিতে।
গানের কলির অলিতে গলিতে
বাস্‌ গেল, ক্লাস্‌ গেল কালের জয়যাত্রায় কেটে।
জাঁদরেল প্রোফেসরের মাথায় নাম্‌ল
ব্যঙ্গাতীত ক্ষমার আকাশে প্রথম করুণার আশীর্বাদ।
কাব্যেই হল করুণা ; করুণায় কাব্য
সেই দিন প্রথম।

নাম্‌ল সন্ধ্যা,
সূর্যদেব, এখানে নাম্‌ল সন্ধ্যা,
কবিতার সন্ধ্যা
পিলু বারোয়ার সন্ধ্যা।
একাকার এই ম্লান মায়ায়
জাগরহৃদয়ের গোধূলিলগ্নে
শুধু নীলাভ একটু আলো এল
তোমার পোস্টকার্ড,
আর এল তোমার ট্রেনের অস্পষ্ট দূরাগত ডাক।

সূর্যদেব, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে' চলে'
যাক্‌।

বাসের একি শিংভাঙা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!

এদিকে আর পঁচিশমিনিট—
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর।

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে স্বৈতাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।
বড়োবাজারের উপলউপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত
উগারিছে ফেনা
আর বিড়ির আর সিগারেটের আর উনুনের আর মিলের ধোঁয়া
আর পানের পিক্
আর দীর্ঘশ্বাস,
বড়োবাবুর গঞ্জনায়
বড়োসাহেবের কটা চোখের ব্যঞ্জনায়
দাম্পত্যমিলনের শ্রান্ত সম্ভাবনায়
অপত্যাধিক্যের অনুশোচনায়
ট্রামের বাসের কারের ফেরিওয়ালার রলরোলে।
এই ক্লাইভ্ ডালহৌসি লায়ন্স্ রেঞ্জের ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের
ক্লান্ত নীরবতায়
তিক্ত গুঞ্জনে
শুধু অস্পষ্ট একটা বিরাট লাগ্‌ডাঁট আওয়াজ
যেন শিশিরভেজা মাটিতে পাতাঝরার গান
বা যেন একটা বিরাট অতনু দীর্ঘশ্বাস
বড়োবাজারের ক্ষতবিক্ষত কিন্তু অমর আকাশে
তারায় তারায় কাঁপন লাগে যার মীড়ে মীড়ে।

নিতে হল ট্যাক্সি।
নতুন ব্রিজে কি ট্রামলাইন পাতবে ওরা ?

হে বিরাট নদী !
স্টীমারের বাঁশী
খালাসীর গান

সবপেয়েছির দেশে
কফেনের দেশে
যত কিছু বই ছিল সব পড়ার শেষে
ক্লান্ত রক্তের বিবর্ণ আবেশে
স্টীমারের বাঁশী
আর খালাসীর গান !

ট্র্যাফিক্ থমকে দাঁড়ায়, হোঁচট খায়
বেতালা, বেসুরো, মিলের, কলের, চোঙার ধোঁয়ায়
পল্টনের ফাঁকে ফাঁকে শিরশিরে হাওয়ায়
আলোয় ঝিকিমিকি জলস্রোতে।
জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের গান,
জানিনি আগে, ভাবিনি কখনো
এত লোক জীবনের বলি,
মানিনি আগে
জীবিকার পথে পথে এত লোক,
এত লোককে গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর !

পাঁচমিনিট, পাঁচমিনিট মোটে
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
উদ্দাম উধাও
ট্রেন এল বলে' হাওড়ায়।
ওপারে স্টক্ এক্সচেঞ্জের এপারে রেলওয়ের হাওড়া,
তারি মধ্যে বসে আছেন শিবসদাগর
ট্যাক্সির হৃদ্‌স্পন্দে, ট্র্যাফিকের এটাক্সিয়ায়।

এল ট্রেন
মন্থিত করে' রক্তের জোয়ার
আমারই একান্ত মগ্নচৈতন্য মন্থিত করে',
দেখলুম তোমার ক্রোস্-অপ্ মুখ জানলায়,
—একটা কুলি—
শুনলুম যেন ভোরবেলাকার ভৈরবীতে।

হায়রে! আশার ছলনে ভুলি!
কোথায় তুমি! ট্রেন ত এল!
কয়লাখনি ধসে' পড়ুক,
ধর্ম্মঘট নাই বা থামলে,
ট্রেন ত এল!
তোমার কি অসুখ হল?
তোমার বাবার?
হঠাৎ দেখি লাবুসি
বল্লে, এই যে, কি খবর,
আমার জন্যে এলেন নাকি?
দিদি আসবে সাতুই।

ভেবেছিলুম তন্দ্রালসা সন্ধ্যার গোধূলি-ছায়ায়
ট্যাক্সির নিঃসঙ্গ মায়ায়
ট্রেনের ছন্দে স্পন্দিত তোমার হৃদয়ের গানে
হাতে হাত উষ্ণতায়
করব সেই চরম প্রকাশ, সেই পরম যবনিকামোচন! হায়রে!
—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব কোন্ খেয়ালের
বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

১১৭ ক্রেসিডা

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘরজনীর সবিতা।

* * *

হৃদয় আমার খেয়ার যাত্রী বৈতরণীর পার।
কাণ্ডারীহীন বালুকা বেলায দৃষ্টি ঘুরিছে দূরে।
হৃদয় আমার ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসের হাহাকার।

* * *

দিনগুলি মোর তুলে নিলে অঞ্চলে।
বালুচরচারী দৃষ্টিতে ঝরে সান্নিধ্যের ধারা।
রাত্রিও চাও ? শ্রাবণের ধারাজলে
মুখর হৃদয় তালীবনদীঘি কল্লোলে অবিরাম।

* * *

ক্রেসিডা ! তোমার থমকানো চোখে চমকায় বরাভয়।
আশ্লেষে তব অনন্তস্মৃতি ক্রতুকৃতমের শেষ।
তোমাতেই করি মত্ত মরণে জয়।

* * *

মহাকাল আজ প্রসারিল কর মোর দক্ষিণ করে।
ভীরু দুর্বল মন !
দৈবের হাতে হাত বেঁধে যাওয়া মহাসিন্ধুর পারে !
সর্ব-সমর্পণ !

* * * * *

হেলেনের প্রেমে আকাশে বাতাসে ঝঞ্ঝার করতাল।
দ্যুলোকে ভূলোকে দিশাহারা দেবদেবী।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে' গেছে রজনীগন্ধা-বনে।

* * *

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগনকোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন গোধূলি ডুবে গেল খর রক্তের কোলাহলে।

* * *

লাল মেঘে ঠেলে নীল মেঘ, নীলে ধোঁয়া মেঘেদের ভীড়।
মেঘে মেঘে আজ কালো কল্কীর দিন হল একাকার।
বিদ্যুৎ নেভে ঈশান-বিষাণে, বজ্রও দিশাহারা।
এলোমেলো পাখা ঝাপটি তবুও ওড়ে কথা ক্রেসিডার।

* * *

ভ্রান্তি আমাকে নিয়ে' যায় যদি বৈতরণীর পার,
ভবিষ্যহীন আঁধার ক্লান্তি কাকে দেব উপহার ?
তপ্ত মরুর জনহীনতায় কোথায় সে প্যাণ্ডার ?

* * *

স্বসমুখ সে কোন্ দেবতার স্বৈরাচারী সম্ভাষে
অমরাবতীর সমাহারী নারী হেলেনের বালালোল !

মোর কুরুবক জেবলী কেবল, ঝরে জবাসংকাশে !

* * *

সূর্যালোকের ধারায় জেগেছে জীবনের অংকুর।
আত্মদানের উৎসেই জানি উজ্জীবনের আশা।
অসূর্যলোকে বন্দী, কুমারী, তোমাতেই খুঁজি ভাষা।

* * *

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র বিস্মৃতি-কীট কাটে।
প্রাণোপাসনার পূজারী তাইতো তোমার স্মরণ মাগি।
প্রাণহন্তারা রণরোলে চলে ট্রয়ের মাঠে ও বাটে।

* * *

উষসী আকাশ ধূসর করেছে মরণের আনাগোনা।
হেলেনের বুকে শবসাধনার বিশ্রাম আর নেই।

আমার হৃদয়-ঘটাকাশে শুধু জীবনের আরাধনা।

*   *   *

ট্রয়ের প্রাচীর ভঙ্গুর কেন ? কোন্ হেলেনের
অমর রূপের প্রখর আবেগে বিপুল বিশ্ব হারাল দিশা ?
লোকোত্তর এ রূপসী বা কেন ? লোকায়তিক এ মরণ-তৃষা ?

*   *   *

জানি জানি এই অলাতচক্রে চংক্রমণ।
সোৎপ্রাসপাশে বলি নাকো তাই কথা।
ক্রেসিডা ! আমার প্রচণ্ড আকুলতা—
জীজিবিষু প্রজাপতির বিভ্রমণ।

*   *   *

সোনালি হাসির ঝরণা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।—
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হাল্‌কা হাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল ?

*   *   *

এই তবে ভোরবেলা !
হে ভূমিশায়িনী শিউলি ! আর কি
কোনো সান্ত্বনা নেই ?

*   *   *

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজ তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি ?

*   *   *

দুঃস্বপ্নেও প্রেম করে নি এ আশা।
শত্রুশিবিরে কুমারীর নত চোখে, মুখে, সারা শরীরে নগ্নভাষা।
হে গ্রীক নাগর ! ট্রয়কে হারালে আজই !

*   *   *

কালের বিরাট অট্টহাসির ছায়া

[illegible] দিল ঢেকে তোমারও মরণ-মায়া—
হে মাতরিশ্বা, মহাশূন্যের সুখে
তুড়ি দিয়ে' যাই তোমারও প্রবল মুখে।

* * *

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে' দেবে ?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন।
লোকায়ত মোর স্বেচ্ছাবর্মে লেগে
বর্শা তোমার হ'য়ে গেল খান্-খান্।

* * *

বুদ্ধি আমার অপাপবিদ্ধময়াবির।
জড়কবন্ধ অন্ধ কর্মে ফুৎকার মোর নর্মাচার।
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য মাগিনা। মন তুষার।

* * *

পাহাড়ের নীল একাকার হল ধূসর মেঘের স্রোতে
পাঁচ পাহাড়ের নীল।
বাতাসেরা সব বাসায় পালাল মেঘের মুষ্টি হতে।
স্তব্ধ নিথর পাঁচ-সায়রের বিল।

* * *

শিবা ও শকুনি পলাতক, জানি ভাগ্য তো কৃকলাস।
কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রপ্রস্থ, পরীক্ষিতেরই জয়।
শরৎমাধুরী লুট করে' ফিরি—জয় জয় টুয়লাস্।
উল্লাসে গায় পালে পালে ক্রীতদাস।

* * *

বিজয়ী রাজার দানসত্রের শ্রাবণ পুলাবনে ভাসে
পুরজন আর গৃহহীন যতো বুভুক্ষু ভিক্ষুক।

হায়েনার হাসি আসে স্মৃতিপটে—বেহিসাবী ক্রেসিডা সে !

*　　*　　*

তুমি চলে' গেলে মরণ মারীচ মায়াবীর ডাকে মূক-
বধির ওষ্ঠাধরে।
তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী।

কালো সন্ধ্যায় তুলে দিলে শ্বেত বাহু—
স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি ॥

১১৮ ঘোড়সওয়ার

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার,
হৃদয়ে আমার চড়া।
চোরাবালি আমি দূরদিগন্তে ডাকি—
কোথায় ঘোড়সওয়ার ?

দীপ্ত বিশ্ববিজয়ী !　বর্শা তোলো।
কেন ভয় ?　কেন বীরের ভরসা ভোলো ?
নয়নে ঘনায় বারেবারে উঠা পড়া ?
চোরাবালি শুধু দূরদিগন্তে ডাকি ?
হৃদয়ে আমার চড়া ?

অঙ্গে রাখিনা কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।
এখানে কখনো বাসর হয় না গড়া ?
মৃগতৃষ্ণিকা দূরদিগন্তে ডাকি ?
আত্মাহুতি কি চিরকাল থাকে বাকি ?

জনসমুদ্রে উন্মথি' কোলাহল
ললাটে তিলক টানো।
সাগরের শিরে উদ্বেল নোনাজল,
হৃদয়ে আধির চড়া ।

চোরাবালি ডাকি দূরদিগন্তে,
কোথায় পুরুষকার ?
হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর !
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর,
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার ?

*   *   *

হাল্‌কা হাওয়ায় বল্লম উঁচু ধরো।
সাত সমুদ্র চৌদ্দনদীর পার—
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় দু'হাতে ভরো,
হঠকারিতায় ভেঙে দাও ভীরু দ্বার।

পাহাড় এখানে হাল্‌কা হাওয়ায় বোনে
হিমশিলাপাত ঝঞ্ঝার আশা মনে।
আমার কামনা ছায়ামূর্তির বেশে
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে ।
কাঁপে তনুবায়ু কামনায় থরোথরো।
কামনার টানে সংহত প্লেসিয়ার ।
হাল্‌কা হাওয়ায় হৃদয় আমাব ধরো,
হে দূরদেশের বিশ্ববিজয়ী দীপ্ত ঘোড়সওয়ার !

সূর্য তোমার ললাটে তিলক হানে।
নিশ্বাস কেন বহিতেও ভয় মানে !
তুরঙ্গ তব বৈতরণীর পার।
পায়ে পায়ে চলে তোমার শরীর ঘেঁষে
আমার কামনা প্রেতচ্ছায়ার বেশে।
চেয়ে দেখ ঐ পিতৃলোকের দ্বার !

জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার—
মেরুচূড়া জনহীন—
হাল্‌কা হাওয়ায় কেটে গেছে কবে
লোকনিন্দার দিন।

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর!
আয়োজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

১১৯ পদধ্বনি

পদধ্বনি!
কার পদধ্বনি
শোনা যায়?
মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মত কেঁপে ওঠে
রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী॥
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃত-আঁধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসুরারে
ছিন্ন করে' দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার

বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতোবার যতো ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলায়।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে
বিচ্ছুরিত ধূম—
বিস্তীর্ণ জীবন ভরে' বুনে গেছি কত শত আকাশকুসুম—
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !
ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা !
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী !
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঙ্গিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে
সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে' দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সংকুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়,
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে' ফিরে' আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি,
হুঙ্কার, টঙ্কার,
উৎসবের অবসরে আমাদের পলায়ন

যাদবের পশুপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি, সেই পদধ্বনি
আমাদের স্মৃতির বাসরে
অরিক্ষু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাটচৈতন্যে তাকে ক'রেছ স্বীকার।
তবু পদধ্বনি
হৃদ্‌পিণ্ডে যে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা।
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির !
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ সারাক্ষণ সেই পদধ্বনি !
ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী ? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল ?
দানব জন্তুর পাল ?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে ?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরো ভয়।

মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়
প্রচণ্ড কিরাত !
উন্মথিত হিমশীলা, তুষারপ্রপাত ঝরে,
পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন !
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল ! পাশুপত ছল !
আহা ! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার
উদার প্রসাদ !
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ একি কলরব ! পদধ্বনি ! দুরন্ত মিছিল !
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
উর্ধশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীত অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
নিত্যনব আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায় কালের ধারায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে ;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে
বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নূপুরমঞ্জীরে আর ঘোর শঙ্খরবে মেতে উঠে
কার পদধ্বনি !
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি ! কারা আসে সংকুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে'
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে' ধমনী

কার পদধ্বনি আসে ? কার ?
একি এল যুগান্তর ! নবঅবতার কোন্ !
কার আগমনী !'

এ যে দস্যুদল !
সুভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে
ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা স্বর্ণিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কানে তার মত্ত পদধ্বনি
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়. ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয় ॥

১২০ এলুসিনোরে

এ কী বৈশাখী সারাদিন আজ ধারা
এখানে, এখানে শীতল বন্যা বজ্রে ও বিদ্যুতে
আজ এই, আর কাল হয়তো বা শ্মশান কালীর জ্বালা
এক ফোঁটা জলকণা নেই, চোখ
এমনি কি চোখ অশ্রুবাষ্পহারা !

তোমার হৃদয়ে ঘরভাঙা পাক ঠাঁই
তোমাকে আজকে হাওয়ায় হাওয়ায় চাই
বটের ছায়ায় চৈতালী নিশ্বাস।

এখানে যখন প্রসাদ ওখানে প্রতিবেশী উপবাসী
ওদিকে আকাশ মুক্ত অথচ এলসিনোর তো কারা
দানেমার্কের রাজাসনে লাগে ঘুণ।
হাওয়ার কলুষ লুব্ধপাপের খুন।
তুমি আনো আজ জীবনের বিশ্বাস !

দুইতটে এসো বাঁধি বৈশাখী বন্যা
পাগলা হাওয়াকে গড়ে তুলি এসো দৈনন্দিন দ্বৈতে
আমার মরুভূ আমার অকালবৃষ্টি
বাঁধব দুজনে পাহাড়ভাঙানো তটে তটে গড়া ঝর্ণা
পরস্পরের সাধারণ্যেই তোমাকে চাই অনন্যা।

চিন্তা আমার গুহাহিত, উদ্দেশ
রাজায় পায় না, হন্তারকের হাতে
অধরা চিন্তা, এদিকে হৃদয় হৃদয় আমার মাতে
পাহাড়ে সাগরে রাজপথে পথে দুর্গের দৃঢ় ছাতে।
হোরেশিও শুধু চেনে সে ছদ্মবেশ।

শোনো ওফেলিয়া দোঁহার আত্মদানে
তোমার শরীরে সারেঙীর গানে গানে
জীবনের মহামুদঙ্গে নাচে অর্ধনারীশ্বর।
মন দাও প্রাণ দাও সারা দেশে অনাচারে জর্জর।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
কুটচক্রের অন্ধ আঁধারে ভাষা
তোমার উৎসে যদি পাই উচ্ছ্বাস।

ওরা কি সবাই দেখেনি বিরাট ছায়া
বধির কালের অতন্দ্র অধিপতিকে ?
এ প্রেতলোকের দুর্গন্ধে কি আমি শুধু দিশাহারা
এল্‌সিনোরের অলিতে গলিতে শিউরে ওঠে নি সাড়া ?
শপথ জানাই আমি তো জানাই শপথ।

পিতৃপুরুষ আমিই-বইব জীবনের দায়ভাগে
বন্ধু আমার মানবতা তার স্মরণে দীর্ঘকাল মানবসভ্যতার।
আর আছ তুমি হে তন্বী সংহতি
মেলাও অতনু-রতিকে।

বন্ধু আমার বিশ্ব মিলায় হাতে।
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
আশা হতাশার অগম প্রত্যাশায়।

তুমি যৌবন জীবন মূর্তিমতী
ভাস্বর তনু তুমি আগামীর সতী
তুমি নির্মাণ দুতারার গান
আমার ঘৃণাতে প্রেমে দাও দিক
তুমি সখী বধূ মাতা হে প্রেয়সী তুমিই প্রাকৃত গতি।

তোমার সত্তা প্রগতি মেলাও আমার আকস্মিকে
হঠাৎ মেঘের অকাল ধারায় মেটে না আমার তৃষা
দিশাহীন ঘোরে আমার শপথ এলোমেলো চৌদিকে।

নবীন তোমার দুবাহু আমারই পিয়ালগাছের শাখা
বৃদ্ধ পিতার বৃথাই অন্ধ দাবী
(মাটির কি দাবী কুরুবক মন্দারে ?)
কে বাপ কে ভাই জীবনের দাবী ধুয়ে দেয় যারা
পদলেহী চাটুকারে।

তুমি জয়গান আষাঢ়ের গান মেঘে মেঘে একাকার

এসো দুইজনে মৃত্যুর পূতি দূরে করি খরস্রোতে
জুঁই-চামেলিতে সুবাস ছড়াই স্বচ্ছ হাওয়ায় হাওয়ায়
জীবনের তটে তটে বিস্তারি নবজীবনের পলি।
এল্‌সিনোরের নরকে দিয়ো না বলি
তোমার এ দিনেমারে।

হাওয়ায় হাওয়ায় হাতে হাতে নীড় দাও
দ্বন্দ্বমুখর অবসাদ ছিঁড়ে নাও
মুখে এনে দাও প্রস্তুতিঘন ভাষা।

কালের বাগানে মিনতি আমার শোনো
ওফেলিয়া তুমি মিথ্যা হিসাব গোনো
এনো না কো চোরাগলি
বাঁচবে না তবে গ্রামের মরাই মরবে শহরতলী।

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধদলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ
এবারে তো হবে ভাঙতে এ বিকিকিনি দীর্ঘ আশার বলে
এই প্রেতলোক জীয়াতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে।

সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল
কিম্বা কালের বাগানে আমার ঘুমভাঙানিয়া মালিনী।
ঘোচাও আমার অধীর ছদ্মবেশ ॥

১২১ আইসায়ার খেদ

And he looked for judgement,
but behold oppression,
For righteousness,
but behold a cry.

বয়স হয়েছে ঢের, পেন্‌সন্‌ই তো পঁচিশ বছর।
সবুজ সবুজ নদী আজ প্রায় নীলিমা ভাস্বর।

কর্ম সবই পণ্ডশ্রম, চাকরি সে তো পেটের চাহিদা,
গর্বের বিষয় কম—কখনো নজর তথা সিধা
নিই নি, সান্ত্বনা তাতে যে টুকু এ পঁচিশ বছর।

বয়সে পেন্‌সন্‌ নিই, জন্ম থেকে পঞ্চান্ন হুবহু,
জীবন উঠতি ছিল ছোটোখাটো ব্যর্থতার মাঠে
করি নি তছনছ কারো প্রাণমান রাজদণ্ডধর
'মুরুব্বি পাকড়ি' বক্ষে উচ্চাশার অশ্ব পাথসাটে,
কৃষ্ণপদে নেত্র বুজে' ফেলি নিকো থিয়েটারী লোহু।

সেকালে শুনেছি গল্প ব্রহ্ম শিখ সিপাহী বিদ্রোহ,
আতঙ্ক উল্লাস তার উত্তেজনা—কন্‌ পিতামহ।
সুদূর গল্পের রেশ, মনে পড়ে বুওর সময়,
অসহায় পক্ষপাত, তারপরে আবার আবহ
খনাল পশ্চিমে, সেই এমডেন জাহাজের মোহ !

সবুজ সবুজ নদী আজ নীল সুনীলে ভাস্বর
তবু ভাবি যন্ত্রণায় মাথা কুটে' একান্ত অসহ
যোগের সে আন্দোলনে ব্যর্থ হাকিমের রূঢ় স্বর
নদীতে মোচার খোলা কাঁপে কোন্‌ বেগে ভয়াবহ—
মাথা তুলে' পথ চলি, চৌরঙ্গীর ফুরাল সম্মোহ !

শুনেছি অমান্য মন্দ, তবু তো সে অমান্য উৎসবে
আমার ঘরেও সাড়া পড়েছিল পেন্‌সনের ঘর !
চাষীরা চালায় কাস্তে, মজুরেরা মুষ্টিবদ্ধ খাটে।
তারপরে কালযুদ্ধ মৃত্যু আর মৃত্যু মন্বন্তর
ক্রমান্বয়ে মহামারী নরকের নবান্ন উৎসবে।

নরক কি এ রকম ? বাংলার গ্রাম ও শহরে
লক্ষ জন দগ্ধগৃহ, কেউ বেশ ওসারে বহরে,
নরকে জানে না শুনি আছে তারা দুরন্ত নরকে
রৌরব প্রাসাদে হাসে শাদা কালো গৌরব প্রহরে
দধীচির হাড় জ্বলে, কী দেয়ালি বিবস্ত্র মড়কে !

কি জানি, বৃদ্ধ যে দন্তনখহীন, আশিটি বছর
জরিষ্ণু মানসে ভাসে, সামান্য চাকুরে চিরকাল।
বাড়িতে অশান্তি ঘোর, সন্তানের সন্তানেরা শত
মতামতে ভাঙে ঘর, একজন কারবারে লাল
অকালে, দেখি ছোটজন অসিধারব্রত

যুদ্ধে দেয় পক্ষপাত, বলে আজ কালের ঘর্ঘর
এ যুদ্ধে এনেছে ফের পাঞ্চজন্য, দাবী পক্ষপাত,
বলে, বিশ্ব এক, বলে, শনিগ্রহদের কক্ষপাত,
সেও নাকি মানুষের হাতে ; দেখি নয়নে ভাস্বর
তার নীল নদী বয়, দুই তট সবুজ উর্বর।

আমার বয়স ঢের দেখি তার পঁচিশ বছর।

১২২ ভিলানেল্

(Villanelle)

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
সে কার হাওয়া আনে বনের নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

আলোয় ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে
পরশ মেলে মেলে তুমি যে ধরো খুলে,
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওয়া-আসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে;
অস্ত গোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে ?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে' দুলে'
ত্বরিতে কাঁদা আর চকিতে মৃদু হাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

সে তরু এ হৃদয়, তুমি যে-তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে, ছায়ায় দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-)

১২৩ নীলিমাকে

রাত্রিতে জেগে ওঠে যে সাগর
অন্ধকারের সাগর—
তুমি তাতে স্নান ক'রে এসো, নীলিমা,
তোমার চোখ হোক আরো নীল
চুল হোক ধূসর ফুলের মঞ্জরীর মতো।

আর যদি রাত্রিকে বিদীর্ণ করে' ওঠে চাঁদ
তোমার আঁচলে লেগে থাকে যেন সিক্ত জ্যোৎস্না
তোমার বুকে পাই যেন জ্যোৎস্নার গন্ধ;
বলতে পারো, সে জ্যোৎস্না কি নীল হবে নীলিমা,
নীল পাখির পালকের মতো ?

জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা ক'য়ে উঠলো—
আর মেঘের গায়ে-গায়ে নেমে এলো স্বপ্নরা ?)
আমার চোখ নরম হ'য়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

১২৪ রাত্রিকে

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো।
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে-রাত্রির মানে।
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর ;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের আয়ুর উপর
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন ॥

১২৫ পৃথিবীর সেই সব দিন

পৃথিবীর সেই সব দিন
সেই সব জন্মের উল্লাস
এখনো স্মরণ করি ঃ

কুমারী মাটির চোখে সেই এক প্রথম বিস্ময়,
প্রথম শিশুর নাম
বলে গেল একদিন স্বপ্নের আকাশ,
ধানের মঞ্জরী দিয়ে লিখে গেল হেমন্তের স্মরণীয় কোনো সূর্যোদয়।

সে আশ্চর্য লোহিত জীবনে
ঝ'রে পড়ে সময়ের ধুলো,
দিগন্ত ধূসর হয় সময়ের শবে।
হে আকাশ, স্বপ্ন চাই
চাই আর একবার নূতন বিস্ময়
আবার এ কুমারী-কামনা
মাটির গহন অবয়বে।
খনির ভ্রূণের শিশু
পউষের সূর্যে মেলে চোখ,
আকাশ তখনো ঝিলিমিল
ঢেউ তোলে ঢেউ ভাঙে সময়ের সজীব সলিল।

ম্লান হয়ে এলো সেই পৃথিবীর ঘ্রাণ,
সময়ের শিথিল শরীর
মৃত্যুর বুদ্বুদে ক্ষত,
মরা গান
বিস্মৃত আকাশ
মাটির স্থবির চোখে আজ।
এ-চোখ আবারো হবে কুমারীর চোখের আকাশ
স্বপ্নের পাখির ঝাঁক
সে-আকাশে উড়ে যাবে সহস্র পাখায়।
পৃথিবীর সেই জন্মদিনে
রেখে যাই আমার বিস্ময়'
আমার চোখের আলো
মনের খানিক পরিচয়॥

১২৬ মনে থাকবে না

মনে থাকবে না !
এই আলো, এ বিকেল, এই বেচা-কেনা,
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ নিবিড় পৃথিবীর, নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

তবু কিছু থাকবে কোথাও,
এই আলো এই ছায়া যখন উধাও
বিকেলের উপকূলে বিকেলের শ্বাস ফেলে চুপচাপ ঝাউ
আলো-লাগা, ভালো-লাগা মন—নেই তা-ও
তখনো হয়ত কিছু থাকবে কোথাও।

তখনো থাকবে ছবি তোমার-আমার।
দেখবে পারো না একা হৃদয়ে তাকাতে তুমি আর,
যতোবার
তাকাবে দেখবে কেউ আছে তাকাবার ;
অপলক চোখ যেন কার
তোমার চোখের পাশে—হয়ত আমার।

অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-)

১২৭ ফাল্গুন

ছিট্‌কিনি নড়ে উপরের জানালায়,
একটু কবাট ফাঁক,

চুড়ির ঝিলিকে একটু আলোর চিড়,—
দুইখানি সাদা হাত ঃ
দুইটি কবাট দুই দিকে সরে যায়।
গোধূলির আলো পাখা ঝাপ্‌টায় চোখে মুখে বুকে এসে,
ধু-ধু হাওয়া খেলে এলোচুলে, পর্দায়।

নদীর ও-পারে আকাশে আবির-ঝড়,
আল্‌তা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু-ধু হাওয়া এলোচুলে,—

দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

১২৮ মায়াতরু

এক-যে ছিল গাছ
সন্ধে হ'লেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
আবার হঠাৎ কখন
বনের মাথায় ঝিলিক মেরে মেঘ উঠ্‌ত যখন
ভালুক হ'য়ে ঘাড় ফুলিয়ে কর্‌ত সে গর্‌গর্‌
বৃষ্টি হ'লেই আস্‌ত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
এক পশলার শেষে
আবার যখন চাঁদ উঠ্‌ত হেসে

কোথায়-বা সেই ভালুক গেলো, কোথায়-বা সেই গাছ,
অঙ্কুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
ভোরবেলাকার আবছায়াতে কাণ্ড হ'ত কী যে
ভেবে পাইনে নিজে,
সকাল হ'লো যেই
একটিও মাছ নেই,
কেবল দেখি প'ড়ে আছে ঝিকির-মিকির আলোর
রূপালি এক ঝালর।

১২৯ ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম

ভাঙলো যখন দুপুরবেলার ঘুম
পাহাড়-দেশের চারিদিক নিঃঝুম,
বিকেলবেলার সোনালী রোদ হাসে
গাছে পাতায় ঘাসে।

হঠাৎ শুনি ছোট্ট একটি শিস,—
কানের কাছে কে করে ফিসফিস ?
চম্‌কে উঠে ঘাড় ফিরায়ে দেখি,
এ কী !
পাশেই আমার জান্‌লাটাতে পরির শিশু দু'টি
শিরীষ গাছের ডালের 'পরে করছে ছুটোছুটি।

অবাক কাণ্ড—আরে!
চারটি চোখে ঝিলিক খেলে একটু পাতার আড়ে।
তুলতুলে গাল, টুকটুকে ঠোঁট, খুশির টুকরো দু'টি
পিঠের 'পরে পাখায় লুটোপুটি,
একটু পরেই কানাকানি, একটু পরেই হাসি—
কচি পাতার বাঁশি—
একটু পরেই পাতার ভিড়ে ধরছে মুঠোমুঠি
ন্যাংতা-আলোর বুটি।

এমন সময় কানে এলো পিটুল পাখির ডাক
একটু গেলো ফাঁক,—
এক ঝলকে আর এক আকাশ চিড় খেয়ে যায় মনে
আরেক দিনের বনে,—
তারি ফাঁকে পাৎলা রোদের পর্দাটুকু ফ'ড়ে
এরাও গেলো উড়ে,
রইলো প'ড়ে ঝরা-পাতা, রইলো প'ড়ে ঢালু
পাহাড়-ধসা লাল গুহাটার হাঁ-করা ঐ তালু।

বিমলচন্দ্র ঘোষ (১৯১০-)

১৩০ এক ঝাঁক পায়রা

উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে,
চঞ্চল পাখনায় উড়ছে।
নিঃসীম ঘননীল অম্বর
গ্রহতারা থাকে যদি থাক নীল শূন্যে।

হে কাল, হে গম্ভীর
অশান্ত সৃষ্টির
প্রশান্ত মন্থর অবকাশ
হে অসীম উদাসীন বারোমাস।

চত্রের রৌদ্রের উদ্দাম উল্লাসে
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
শুধু শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
এক ঝাঁক উজ্জ্বল পায়রা ॥

দুপুরের রৌদ্রের নিঃঝুম শান্তি
নীল কপোতাক্ষীর কান্তি
এক ফালি নাগরিক আকাশে
কালজয়ী পাখনার চঞ্চল প্রকাশে—
চৈতালি সূর্যের থমথমে রৌদ্রে
জীবন্ত উল্লাসে উড়ছে
পাঁচরঙা এক ঝাঁক পায়রা ॥

একফালি আকাশের কোল ঘেঁসা কার্ণিশ
রঙচটা গম্বুজ, দিগন্তে চিমনি,
সোনার প্রহর কাঁপে চঞ্চল পাখনায়
ছোট্ট কালের ঘোরে প্রাণ তবু তন্ময়
লীলায়িত বিস্ময়।
সৃষ্টির স্বাক্ষর এক ঝাঁক পায়রা।

রুপালি পাখায় কাঁপে ত্রিকালের ছন্দ
দুপুরের ঝলমলে রোদ্দুর
হে কপোত, পারাবত, পায়রা,
যে দিকে দু'চোখ যায় দেখা যায় যন্দুর
রুপালি পাখায় আঁকা শূন্য।
আকাশী-ফুলের শ্বেত পিঙ্গল কৃষ্ণ
কম্পিত শত শত উড়ন্ত পাপড়ি
তুমি নেই, আমি নেই, কেউ নেই,
দুপুরের ঝলমলে জীবন্ত রৌদ্রে
উড়ে শুধু এক ঝাঁক পায়রা।

১৩১ দুপুর বেলার চম্পু

সারা দুপুর ব'সে ছিলুম বকুল গাছের তলায়
আশেপাশে কত গাছপালা
কত ফল-ফুল, কত লতা-পাতা,
বর্ষা তখন শেষ হয়েছে
আকাশ তখন স্বচ্ছ
মেঘেরা সব হারিযে গেছে নিরুদ্দেশের পথে।

কিসের যেন গন্ধ পাচ্ছি
বলতে না পারা বনের মিঠে গন্ধ,
সামনে খানিকটা জল জমে আছে
অনেক দিনের আকাশ-ঝরা জল।
সে জল তখনো শুকোয়নি
বেরুবারও পায়নি পথ
ভিজে মাটির আলিঙ্গনে নব বধূর মতো কাঁপছে।
তার বুকের তলায় থিতিয়ে আছে

অনেক মাটি অনেক কাঁকর—
অনেক ছিন্ন মুকুল
অনেক জীর্ণ ঝরা পাতা।

তার সেই বাতাস লেগে শিউরে-ওঠা বুকের ওপর,
লুটিয়ে পড়েছে দুপুরবেলার সূর্য,
পতির অনুপস্থিতিতে গোপনচারী উপপতির মতো
ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে
দুপুর বেলার বিজন অবকাশে।

হঠাৎ একটু দূরেই দেখি
একটা বাতাবী গাছ আর বাবলা গাছের ফাঁকে
অপূর্ব অদ্ভুত এক ছবি,
হার মানে তার রঙ ধরাকে মানুষ-শিল্পীর তুলি
কল্পনাও থমকে দাঁড়ায় কিছুক্ষণের শোভায়
মুগ্ধ হয়ে অবাক হয়ে দেখি :

ভোর বেলাকার শিশিরকণার মুক্তা দিয়ে গাঁথা
ঊর্ণনাভের সূক্ষ্মজালে সোনার কিরণ লেগে
ছোট্ট গীতিকাব্য একটি কাঁপছে থরো থরো
ঊর্ণনাভের আটটি বাহুর কোমল আলিঙ্গন।

দেখতে দেখতে ভুলে গেলুম আমার জীবন
আমার মরণ আমার লক্ষ মায়া।
ঊর্ণনাভের সামাজিক নামটা উচ্চারণ করতে
মনে আঘাত পেলুম।
ভাবলুম ঊর্ণনাভ ভালোবাসে
দুপুর বেলার সোনালী সূর্যকে

আর তার হীরকবর্ণ অদ্ভুত দু'টি চোখে দেখলুম
গহনরাতের অপূর্ব এক মায়া।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র (১৯১১)

১৩২ গুহার গান

প্রভু!
তোমার মাথায় পড়ে স্বচ্ছ শুভ্র রাতের কণিকা।
তোমাকে রয়েছে ঘিরে আঁধারের নীরব আলোক।
আমি আছি অতল গুহায়।
বুকের উপর চেপে রয়েছে অজ্ঞতা
গভীর সে রাত,
স্তূপীকৃত পাহাড়ের সমাধির মত।
আমি যেন শুনতে পাই আমার এ সমাহিতি থেকে
নরম রাতের চূর্ণ বিন্দু-বিন্দু ঝরে,
কালো আঙুরের মত গুচ্ছ-গুচ্ছ
তোমার ও-চুলে।
প্রভু!
তোমার বিশাল হাত আমাকে ফিরেছে খুঁজে, জানি,
শিকারী হাতের ছায়া কেঁদে এগছে দেহের উপর।
আমার বুকের রক্ত হয় নি কো এখনো ত হিম।
এক বিন্দু উষ্ণতার যদি জ্বলে জীবন আমার,
এক বিন্দু চোখের আভায়,
এ বন্ধন বন্ধুই আমার।
প্রভু!
তোমার মাথার 'পরে অর্ঘ্য পড়ে
অনাদি রাতের!

তার ঘন স্নায়ুভির ঝড়
আমার অসাড় দ্বারে করে করাঘাত,
চ'লে যায় গ্রহলোক পানে।
আমি থাকি প'ড়ে অসহায়।
পক্ষাঘাত দুর্ভেদ্য প্রহরী।
তোমার কুঠারে করো বিচূর্ণ আমায়।
দুহাত ছড়িয়ে দাও রাতের আকাশে।
আমার এ গুহাকাশে বজ্র হানো, প্রভু
দগ্ধ হোক আমার এ শব।

১৩৩ চন্দ্রলোক

ক্লান্তি নেমেছে নগরের বুকে—
ধুসর মেঘের অঞ্চল ভরা পাপ।
ধনভাণ্ডারে অনশনে মরে
বিরহী যক্ষ—গলিত মাধবী মঞ্জরী আর
নির্জন প্রান্তর।
চর্ব্য, চোষ্য, পানীয় চার্বাকেরও
ধূলি ধূসরিত।
ইতিহাস শুধু হাসে বিধাতার হাসি।
তাই ক্লান্তির ছায়া,
ব্যসনের গ্লাসে—ফণি মনসার
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘোরে কাক।
আয়ু সীমানায় মহাত্মাদের সারি।
কুম্ভীপাকের ভাবনা কাঁপায় পা—
পুণ্যের থলি গোণাগুণি, চাপা
ফিস্ ফিস্ কানে কানে।

নিদারুণ শীতে হাড়ে হাড়ে ঝঙ্কৃত—
তিব্বতী কৈলাস।
দূর হতে শুনি,
লৌহ কবাটে শৃংখল-গুঞ্জন।
এবার শাস্তি-পুরস্কারের তুহিন রাত্রি-দিন।
আর্তনাদের দুর্বার প্রান্তরে
দুয়ার কি যাবে খুলে!
তবু ভাল,
আমি শোভাযাত্রার শেষে।
কুষ্ঠের সারি,
অন্ধ, খঞ্জ, বধিরেরা গলাগলি।
মৃতবৎসার বৎসেরা জমে, মেঘের মতন
হামাগুড়ি দিয়ে দূরে।
অস্ত্রোপচারে, হাঁসপাতালের দল—
অস্ত্রবিহীন, যন্ত্রণা-কুঞ্চিত
কবন্ধদের সারি।
স্বদেশপ্রেমিক,
টেররিস্টদের ঘাড়ে চেপে চলে—
এখানেও বক্তৃতা!
কামুক কামুকী মৈথুনরত—
কুক্কুর কুক্কুরী।
বিশ্বপ্রেমিক মাতালেরা করে
ছায়াদের হাতে আত্মসমর্পণ।

আমাদের ক্লান্ত দেহে
সাড়া নেই প্রারব্ধ পাপের।
প্রাক্তন, জাতক স্রোতে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে, মুছে গেছে আজ।
প্রার্থনার শেষ ঋণ,
শোধ করি তর্পণের তিলে
পিতৃ লোক পানে।

ঊর্ধ্বে জ্বলে ধরিত্রীর কামনা-তপন—
যে কামনা স্থবিরের—
শিথিল পেশী ও মেদে। ঘোরে কৃমিকীট
অন্ত্রে অন্ত্রে।
অগ্নিমান্দ্য তাই কল্পশেষে।
আজ তাই পুংসবন
অনুর্বর বর্বরের হাতে।
পৃথিবীর রক্ত-মাংস চক্রহীন প্রজ্ঞাহীন
পাতালের পথে।
প্রপঞ্চের যাত্রাশেষে ক্ষান্ত তাই স্থবিরের গান।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯১৪-)

১৩৪ রাজকুমার

হে রাজকুমার! উজ্জ্বল খর নভে
রাজ্যশাসন ও দিগ্বিজয়ের কালে
কেঁপেছে নগর অম্বুনিনাদী রবে,
মুণ্ডনিপাত করেছ তালবেতালে।

রূপসীরা কত তব অলক্ত-পদে
বশীকরণের মায়াবী মন্ত্র পড়ে'
সঁপেছে তোমাকে রতি-সুখ-সার মদে।
নারীমেদ-ভারে প্রাসাদ উঠেছে গড়ে'।

রমণীমোহন নবনীকান্ত, যেন
গোধূলি লালিমা পড়েছে অধরে মুখে;

রাজকবি যত বিরচি নান্দী, হেন
মণিকুট্টিম কাঁপায়েছে সুর সুখে।

জানিনা সে কোন রজনীর অবসানে—
(অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের বিষে)
বারেক ফিরায়ে হৃত রাজ্যের পানে
অশ্বখুরের ধূলায় গিয়েছ মিশে।

হাতবদলের ঘটা সে কি নির্ম্মম !
নূতন পতাকা উড়েছে প্রাসাদচূড়ে !
ঝঞ্ঝাতাড়িত চ্যুতপত্রের সম
স্মরণ তোমার কখন গিয়েছে উড়ে।

তারপর একি ! বিধির অপার ছলে
দেখি যে তোমার তরণী বোম্বাই ঘাটে।
টাকার দাপটে হরেক রকম কলে
জনগণমনে উম্বায়ু যত কাটে।

জলবায়ু মাটি আবার তোমার হাতে।
জনসম্পদে কর কোম্পানি ঠেসে।
শেয়ারবাজার 'তেজীমন্দি'র সাথে
গড়াগড়ি যায় তোমার পায়েতে এসে।

কতভাবে ভোল দেখালে কুমার তবে।
মুলতুবী কর বেসাত গায়ের জোরে !
রচি' ব্যূহজাল গোয়েন্দা লয়ে ভবে
রেখেছ ঘিরিয়া সুচির দুর্গ পরে।

আজ অবশেষে জনগণে মিশি নেতা।
এ্যাসেমব্লি হল্ জমাট কর কি সাধে ?

ক্রেতা বিক্রেতা তুমিই তাদের সেথা।

রক্তের দাগ ঢাকবে আর্তনাদে।

১৩৫ সনেট

থেমে গেছে অন্ধ ঝড়; শান্ত হল গ্রহ স্বস্ত্যয়নে ;
হৃদ্‌পিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে আমার জীবনে
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড় অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।
বনপথ অলিগলি স্বপ্নালোকে হল জাগরিত।
ভগ্নমৃত দেহ নিয়ে ঈগলের নেইকো বিবাদ।
কুক্কুটের জয়গাথা অরণ্যেরে করে বিচলিত।
তবু কি রয়েছে ভ্রান্তি ? জানি জানি নগরে বিপ্লব
আর যত নাগরিক হৃদয়ের ঘন ওঠাপড়া
মুহূর্তে গিয়েছে থেমে। জাতিস্মর অরণ্য পল্লব
প্রাক্তন ধরণী বক্ষে ছিন্নপত্রে দেয় বুঝি ধরা।
ধনতন্ত্র রজনীর বিপর্যস্ত পেটিকোটে আহা,
মেদবাহী গণিকার সুষুপ্তিতে কি আছে সুরাহা !

দিনেশ দাস (১৯১৫-)

১৩৬ কাস্তে

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু !
শেল আর বম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শা দিও বন্ধু !

নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভাল বাসতে ?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হল কাস্তে !

ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া
কাল যারা করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে ঠোকাঠুকিতে
আজ তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ ঃ

চূর্ণ এ লোহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
গ'লে পরিণত হয় মাটিতে,
মাটির—মাটির যুগ ঊর্ধ্বে !

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়ে
আসে ওই ! চেয়ে দেখ বন্ধু !
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায়ে
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু !

১৩৭ মৌমাছি

জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি স্বপ্ন ছিঁড়েখুঁড়ে গেল ঃ
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোট এক বুনো মৌমাছি,

ডানায় ডানায় যার অরণ্য-ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদাগন্ধ অজানা বনের।

কেমন সুন্দর ওই উড়ন্ত মৌমাছি !
অশ্রান্ত করুণ ওর গুণগুণানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর-পাহাড়ের বন্ধুর বিষন্ন প্রতিধ্বনি !
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ

আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি !

সমর সেন (১৯১৬-)

১৩৮ রোমন্থন

শূন্য মাঠে স্তব্ধ দিন।
যতদূরে চোখ যায়, লৌহরেখা প্রসারিত
নির্বিকার অদৃষ্ট রেখায়।

অন্নজলহীন মৃত্যু হযত,
ভবিষ্যতে হযত দুর্ভিক্ষ, চকিত প্লাবন।
তবু দেখি, ঝুরি ঝুরি শাকসবজী, সহজ সবুজ,
সপ্তাহে দুদিন গ্রামহাট বসে,
বেচাকেনা সাঙ্গ হ'লে
হুঁকো কলকে ঘনঘন হাত বদলায়,
মহাজন চিন্তাহরা গন্ধ ছড়ায়।

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
অবোধ মন, বোঝানো ব্যর্থ।

পুত্রকন্যা এখনো আঙুলে গোণা যায়,
বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
তবু নিজেকে কতোদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
জিভে স্বাদ নেই, জানিনা
কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়
আমার অজ্ঞাতসারে
পুরাতন প্রগল্‌ভ দিনরাত্রি আসাযাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে অন্ধকারে তিলে তিলে পৃথিবী ক্ষয়ে
বুঝি পিঙ্গল বালুরে সর্বভুক অবিনশ্বর।

তাই দিনান্তে কলের বাঁশীতে
মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
করাল শূন্যের বৃত্তে
নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে
লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।

১৩৯ স্মৃতি

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এ ।াম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর;
স্মৃতির দিগন্তে নেমে এলো গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এলো ধূসর পথ বেয়ে ঃ
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হ'য়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এলো অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।

১৪০ মুক্তি

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এলো—
তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল ঃ
সে অন্ধকার মাটিতে আনলো কেতকীর গন্ধ,
রাতের অলস স্বপ্ন
এঁকে দিলো কারো চোখে,
সে অন্ধকার জেলে দিল কামনার কম্পিত শিখা
কুমারীর কমনীয় দেহে।
কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কি করে ছোঁবে ?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

১৪১ একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হোলো ঃ
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

১৪২ মহুয়ার দেশ

(১)

মাঝে মাঝে, সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,

আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায়।
সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।
অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাতের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

(২)

এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি—
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে,
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন।

১৪৩ নাগরিক

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার
মতো রাত্রি

আর দিন
সমস্তদিন ভরে শুনি রোলারের শব্দ,
দূরে, বহুদূরে কৃষ্ণচূড়ার লাল, চকিত ঝলক,
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;

আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে;
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে ধূসর পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল;
ভরা চাঁদ এলো নদীর উপরে,
চারিদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রর কোন দ্বীপ থেকে,—
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধূসর-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য,—
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়ো
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন

আর কত লাল সাড়ী আর নরম বুক, আর
টেরীকাটা বসুণ মানুষ,
আর হাওয়ায় কত গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!
যদি কোনোদিন বর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো:
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে!
কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর বসন্ত
বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
সন্ধ্যার সময়,
রাস্তায় অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাসে
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি—
চারিদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

১৪৪ কয়েকটি দিন

নদীর জলে
শৈশবে দেখেছি গলিত উলঙ্গ শব,
রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে;
আজ সহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিন রাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সোনা;
বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শৃগাল, কোকিল ডাকে;
তারপর এই কর্কশ বালুতে, এই রক্তপঙ্কে
আকাশের নিবিড় নীল আগুন লাগল।

নরম মাংসস্তূপে গভীর চিহ্ন এঁকে
নববর্ষের নাগরিক চলে গেল রিক্ত পথে
সন্ধ্যা নারীর অন্ধকারে পৃথিবীকে রেখে।
দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ীর ছায়ার পিছনে
স্খলিতগতি ভ্রান্ত কুকুর ঘোরে।
ধাবমান কাল
ট্রেনের লোহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ
সন্ধ্যার দিকে তপ্ত আবেগে
স্নিগ্ধ মেঘ আকাশ শান্ত গম্ভীর।
দিন যায়, বসন্ত গতপত্র বহুদিন
গ্রামে গ্রামে মাঘ মাসে দীর্ঘদেহ কাবুলীরা আসে,
ঘুরে ফিরে হানা দেয় ঘরে ঘরে,
বর্বর ভাষায় কাঁচাপাকা দাড়ি হাওয়ায় নড়ে।

চায়ের দোকানে বিনষ্ট দল,
শুধু মনান্তরের কর্কশ কোলাহল।

আজ শুধু মনে হয়,
ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,
পাথর-কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি

* * *

সড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম !
অতীতের শবসম্ভোগী মন
কালের স্থবির যাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধের দল .

স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে ;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

১৪৫ *For Thine is the Kingdom*

একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি।
দারুণ গ্রীষ্ম অভীপ্সা-ব্যাকুল মন
তোমার আদেশে সহরের দিগ্বিজয়ে ঘোরে,
তোমার আদেশে সন্ন্যাসীর সাধনা-সঙীন দিনগুলি
যুবতী-সংকুল আসরে
সান্ধ্য-সংগীতে সংহত।
প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্ব্লি হলে বিরহ ছলে মিলন আনো,
প্রবীণ কবির মুখে আবার আনো
স্বদেশী গান।

রাত্রির দূষিত রক্ত বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে ;
তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
বিরস কাজের সুরে
কতোদিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশী বাজে ;
পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগ্রাত বাসের শব্দ।
পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই :
দিনের ভাঁটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধু ধু করে,
চরাচরে মরা দিনের ছায়া পড়ে।
উদ্দাম নদীতে শেষ খেয়া নেই,
শিকারী কীট সোনার ধানে।

তাই বঙ্কিম ব্রহ্ম যীশু পরমহংস
সময় যখন আসে তখন সকলি মানি,
দুর্গম দিন,
নামহীন অশান্তিতে বিচলিত বুদ্ধি,
তবু সরল চরম কথাটি এই বলে মানি :
ভারি ট্যাঙ্ক ছাড়া কিছুই টেঁকে না,
সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

১৪৬ বকধার্মীক

নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা।
ব্যবসায়ী সংসার
বারে বারে পাকা ধানে মই দিল,
চোখ বেঁধে আজ ভবের খেলায় ভাসা !
তবু ত চারিধারে অদৃশ্য ধ্বংসের স্পোসিয়ার।

নকল দুঃস্বপ্নে আর কতোকাল কাটাই,
সামুদ্রিক মাছের তেলে শরীর বৃদ্ধি;
শীতের কুয়াসায়, নদীর নরম হাওয়ায়
নিজেরি গোলোকধাঁধায় মন অবিরত ঘোরে;
মনে পড়ে
কিছুদূরে দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
কুয়াসায় ঝাপ্‌সা পাহাড়
লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে।
আবার আড়চোখে চেয়ে দেখি আমার মানসপৃথিবীতে
বিরোধের বীজ পুঁজি, কত স্বর্ণবণিক ঢোকে,
কী অপরূপ প্রশান্তি মুখে!
এরোপ্লেনের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় ওড়ায়
বকমুখ মন্ত্রীর নাম।

গাত্রদাহ শুধু নিষ্ফল আক্রোশ।
সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে
ব্রহ্মচারী বেশে পাণ্ডিচেরী যাবো।
— সকালে হাওয়া খেতে নদীসৈকতে আসি,
যদি দেখি—
ফেরী স্টীমার ওপারে, হাওড়ার পোল তোলা,
বসে থাকি বিষন্ন মুখে।

সন্ধ্যার ভিড়াক্রান্ত মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা
দেবতাদের চোখ অনিদ্রা আনে,
পুজোর পচা ফুলে ফুলে পিচ্ছিল পথে
রক্তচক্ষু পুরোহিত হাঁকে,
হাঁকে জগদ্দল বৃষভ।
কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে
রাস্তায় হাসির গররায ঘোরে তুখোড় ইয়ারের দল
রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল;
অবশেষে শূন্যের সরাইখানায়
ভ্রাম্যমান বিলোল দিন অদৃশ্য হয়,
পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ,
কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি।
আবার ব্রাহ্মমুহূর্তে
চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,
অলস হাই তোলে বেকার কুকুর।
দেব নখরে লোলচর্ম, পীত চোখ
ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯১৬-)

১৪৭ কোনো মৃত্যু-শিয়রে— আবহমান

এতোদিন ধ'রে অঞ্চল ধ'রে যতো গোধূলির আলো
কুড়োলে সে-সব ঢালো এইবারে ঢালো

ঝ'রে-পড়া যতো মরা-মুহূর্ত-ফুল
ঝেড়ে ফ্যালো লতা ক'রে ফ্যালো উন্মূল—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
উদ্যত চির-মৃত্যুর সঙ্গীন
মাটির স্বীকৃতি কালে মাটি হয়— এটা মনে রাখা ভালো।

যতোদিন ধ'রে অঞ্চল ভ'রে যতো গোধূলির আলো
নিয়েছো সে-সব ফ্যালো এইবারে ফ্যালো
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
মৃত্যু রয়েছে অলক্ষ্য তার উত্তরী উড্ডীন।
শপথ স্বীকৃতি যা কিছু মাটির সবই কালে হবে কালো—

এতকাল ধ'রে দেহখানি ভ'রে যতো কাঁচাসোনা রোদ
নিয়েছিলে তার হবে আজ ঋণ শোধ
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকবার
কুশীদজীবিনী পৃথিবীর সম্পদ
রেখে যে'ত হয় প্রতি কণাটিও তার
একের দিকেই একা দিতে হয় পাড়ি—
আমরা সবাই সব কিছু পেয়ে সব কিছুকেই ছাড়ি।
তুমি আজো আছো, পরেও থাকবে, তুমি ছিলে চিরদিন
তুমি চ'লে গেলে প্রতীক্ষমাণ দেশ কাল প'ড়ে থাকে
নব ভাবে এসে শুধে যাবে ব'লে পুরানো মাটির ঋণ
পুরোনো প্রথায় খেলাঘর পেতে পুরোনো পৃথিবী ডাকে।

বর্ষার মেঘে থাকবেই লেগে তোমার দেহের কণা
— এই কথা ভুলবো না।
নদীজলে গ'লে মিশে যাবে কোনো তোমার দেহের কণা
—এই কথা ভুলবো না।
যে-মাটিতে গাছ ফুল হ'য়ে ফোটে— তোমার দেহের কণা
তার কথা ভুলবো না।

আকাশে বাতাসে যে-ছাই ছড়াবে তোমার দেহের কণা
— তারও কথা ভুলবো না।
রৌদ্রের তেজে বৈদেহী কে যে তোমার দেহের কণা
— তারও কথা ভুলবো না।
ভুলবো না আমি তোমাকে যে তুমি পঞ্চের সমাহার
পৃথিবীর চোখে উজ্বল ক'রে প্রপঞ্চ পারাবার
চ'লে যাবে তবু যাবে নাকো প্রকৃতই
মরতা নিয়েই মরতাকে জয় ক'রে হ'বে অমৃতই।

যে-কথা রাখোনি তার জন্যেও
যে-কথা রেখেছো তার জন্যেও
যে-বাধা মানোনি তার জন্যেও
যে-বাঁধ বেঁধেছো তার জন্যেও
দুঃখেরো চেয়ে সূক্ষ্ম যে-ভাব তারই ছোঁয়া পেয়ে মন
উদাসীনতায় কী-যে হ'য়ে যায়
শান্ত আবেগ হৃদয় ছাপায়
জীবন পেরিয়ে উপনীত যার উদার উত্তরণ।

সময় তো নেই বলবে কি কিছু ? এই বেলা ব'লে ফ্যালো
শুনছো ? ডাকছে দিকের দেয়াল প্রতীক্ষারত কালো।

মৃণালকান্তি (১৯১৬-)

১৪৮ দিগন্ত

(অংশ)

রৌদ্র দগ্ধ

জেনেছি ব্যর্থ ফুল ফোটাবার গান !
মৌমাছি কল্পনা,
রৌদ্রদগ্ধ তাদের রঙিন ডানা।

ঐ বনছায়া,
নিরালা রাতের চাঁদ—
স্বপ্ন-জোনাকিগুলি,
ঊষার ধূসর
অঞ্চলে নেয় তুলি।

* * *

খেয়া

এপারে মৃত্যু ওপার অন্ধকার।
দিবারাত্রির সেতুবন্ধনে, হে সুন্দর, অজানার-
খেয়া করো পারাপার।

নাম

পউষের ঝরাপাতা গান শুনি।
একা একা তবু স্বপ্ন বুনি—
রৌদ্র ছায়া দূর নীলে
প্রাণের নিখিলে
শুনি নিরন্তর,
সেই নাম অনাহত
একটি গানের মত
গুঞ্জন মুখর।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৭-)

১৪৯ মৈনাক, সৈনিক হও

স্বার্থান্বেষী ক্রূরচক্রী স্থবির মন্থরা
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ ক্লান্ত জরা দেহে।
অনড় অটল প্রজ্ঞা জীবনের কানে

শুধু এক ক্লান্ত কথা কয়।
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন-রাত প্রেত পদক্ষেপে
বিষণ্ণ নিরন্ন প্রহরে
আসে আর যায়।
আজো কি অরণ্য হায় শুধু স্বপ্ন দেখে
তারাদের দীপপুঞ্জ জাগ্রত রাত্রিতে ?
শিশিরের গানে আর ঝিঁঝিঁদের গানে ?
মিশরের কানে
মন্থর বিষাক্ত ধ্বনি প্রতিদিন আনে
স্ফীত বৃদ্ধ জরদ্গব দিন ;
আয়ুহীন, বলহীন, স্নেহহীন, হীন।

হে বৈরাগী, ভাবো একবার
গর্ভ অন্ধকার
এ ভীষণ নিশ্চিত জরায়ু।

যেদিন সে ফাল্গুনের আরম্ভ প্রহরে
জ্বলন্ত জীবন যেন মৌমাছির পাখা ;
মর্মরিত উচ্চকিত যৌবন-চঞ্চল,
মর্মরিত ঊর্মিবাণীময়,
গেয়েছিল জীবনের জয়।
আজ তারা মিশরের মর্মর মতন
বিস্মৃতির নিঃস্পন্দ শিশিরে
কেন জেগে রয় ?

হে জরদ্গব দিন
উড়ে যেতে পারো একবার
বাদুড়ের মত, ডানা নেড়ে নেড়ে ;
ফিরফিরে
সেই সব আরম্ভ প্রহরে ?

মৈনাক, সৈনিক হও
ওঠো কথা কও।
দূর কর মন্থর মন্থরা—
মেদময় স্ফীত বৃদ্ধ জরা।
রক্তে জাগে পুরানো সূর্যের ইতিহাস;
সে কি পরিহাস ?
এ সুদীর্ঘ দিন-রাত্রি প্রেত-পদক্ষেপে
স্মৃতিকে করেছে পিরামিড।
আর সব ঊর্মিময় আরক্ত প্রহর
মিশরের মমি, হায়,
শিশিরে ধূসর।

মৈনাক, সৈনিক হও।

১৫০ অবসর

আমরা ছিঁড়েছি দুর্গম দিন। মন্থরতা
দিয়েছে অনেক প্রলাপ কাহিনী। স্মৃতির দ্বারে
এসেছে দানব ঈশাণ কোণের ধূম্র রথে :
রাখীবন্ধনী ছিঁড়ে গেছে। আজ, সময় হ'লো ?

এখানে যুদ্ধ। বন্ধ্যা মাটির প্রাসাদ গড়ি
বুদ্ধির ধারে শীর্ণ শরীর শানানো শুধু
মৃত্যুদূতেরা নিশ্চুপ মনে মন্ত্র পড়ে—
দিবা অবসান সেতুবন্ধনে, সন্ধ্যা এলো।

ধারকরা তাপে দেহ সেঁকে নাও, শয্যাশায়ী,
শরসন্ধানী মন মেলে মিছে মিলাতে চাও,
দূরে ঝাউবনে ঘোড়ো রাত কাঁদে ক্লান্ত মনে
বহু বছরের অভিশাপে ভরা স্বপ্ন শুধু।

কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত ডালে আকাশ আলো,
তোমার আমার মধ্যে বিরাট স্মৃতির সেতু:
মাঘের সূর্য তীর্থযাত্রী। বিশাল ছায়া।
প্রলাপী মনের পাঁচিলে রুদ্ধ। মিথ্যে খোঁজা।

১৫১ ধুলো

ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্র-ভরা বিকেল
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি ফলের মতো মনে হয়।
সবচেয়ে অবাক লাগে যখন মনে করি
আমি বেঁচে আছি, আমি দেখছি, আমি ভালোবাসছি।
অবাক লাগে ভাবতে : একদিন এদের আমি দেখিনি,
একদিন এদের আমি দেখবো না
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্র-ভরা বিকেল।

একদিন আমি এদের পাবো না
কিন্তু একদিন যে এদের পাবার আনন্দ
আমার মনের মধ্যে বিন্দু-বিন্দু সঞ্চিত হয়েছিলো
—তাদের রেখে গেলুম, ছড়িয়ে দিলুম
গ্রামের সে নালি ধুলোর পথে।
তামাটে পায়ের ফাটা-চামড়ার চাপ
এই আনন্দকে জীর্ণ করুক।
শিশু খেলা করুক এই ধুলোয়,
মাঠের ফসলের আর হেমন্তের শিশিরের গন্ধ
ছড়িয়ে পড়ুক এই সোনালি পৃথিবীতে—
বাংলা দেশের এই আশ্চর্য ধুলোয়।

হেমন্তের এই আলোর বন্যাময় শান্ত বাংলা দেশের গ্রাম

যত দূর দেখা যায় সোনার ফসল
মাঠের উপর স্তবের মতো নুয়ে পড়েছে
শান্ত নির্বাক সূর্যের উষ্ণ-কোমল স্পর্শ
একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলো
বাঁশবন সির-সির করছে
একটা ফড়িং লাফিয়ে চোর-কাঁটার বনে অদৃশ্য হোলো
আকাশে শঙ্খচিল—
হঠাৎ দূরের মাঠ চিরে কালো মাল-গাড়ি চলে গেলো

হেমন্তের পরিপূর্ণ পড়ন্ত বেলায়
কী নিরর্থক ভাবা ঃ
একদিন ছিলুম,
একদিন থাকবো না।

১৫২ একা

তিন দিন তিন রাত্রি বৃষ্টির পর
ধবধবে রোদ্দুর।
শরতের নীল। মন যায় কদ্দুর !
তিন দিন তিন রাত্রির পর।
হয়তো কত দিন কেটে যাবে
মেঘ হবে পাহাড়ের চূড়ো
হয়তো কত দিন যাবে কেটে
তারা হবে পাহাড়ের ফুল
হয়তো কেটে যাবে কত দিন
কত শত দিন।

দাঁতে দাঁত চেপে
ট্রামের ভিড়ে চলেছো।
অনেক দিন পরে দেখা কী এনেছো ?
রায়বাহাদুর বাজার ক'রে বাহাদুরি কেনেন

সবকিছু সঠিক চেনেন
চকচকে মরা ইলিশ থেকে আঁশটে জল ঝরে
অনেক দিন পরে
দেখা। কী এনেছো ?
এক ঝাঁক রজনীগন্ধা ঐ লোকটার হাতে—
একটু জায়গা চাই ট্রামের পা-দানিতে।
পা মাড়ালো, জামা ছিঁড়লো, তবু চলেছো।
আজকের হঠাৎ-উজ্জ্বল বিকেলে কী এনেছো ?

গান্ধীজী কি ম্যাজিক জানেন ?
স্বাধীন হয়ে কী পাচ্ছো রণেন ?
মরা দেশ মরা মানুষ ফেলে পালালো ইংরেজ
গান্ধী টুপি আর মুসলমানী ফেজ
স্টার্লিঙের দেনা
রাজকন্যের বিয়ের যৌতুকে দিয়েই দেনা !
লাটের বাড়িতে স্বদেশী নিশেন
বুকটা কাঁপছে নাকি, রায়বাহাদুরি পেনসেন
হঠাৎ না ঘোচে !
তিন দিন তিন রাত্রির পর সূর্য চোখ মোছে।
হঠাৎ শরতের নীল
হিন্দু-মুশ্লিম মিল
—উঃ, ভিড়টা কমলে বাঁচি
পকেট মারের কাঁচি
ইনফ্লুয়েঞ্জার হাঁচি
—তিন দিন তিন রাত্রির পর
হঠাৎ শাদা রোদ্দুর
টালিগঞ্জ কদ্দুর ?

কী এনেছো তিন দিন তিন রাত্রির পর
কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুসি, এনেছি আকাশের নীল।

(যত সব বাজে কথার ভূষি)
মিস্টার রায়ের নতুন স্টুডিবেকার
ল্যান্ড-ক্রুজার
আরতিকে নিয়ে তার স্বামী চলেছে আমেরিকা—
তিন দিন তিন রাত্রির পর

তারপর
কী এনেছো ?   কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুসি, এনেছি রৌদ্রের শুভ্রতা—
কী সব ফাঁকা বুলির কাব্যিক কথা !

কিন্তু কী চাও ?   কী চাও বলবে ?
সময়ের বালি ঝরবে, যৌবন মরবে,
সংসার চলবে।
আরো কী চাও বলবে ?

বিকেলের রোমান্টিক আড্ডার পিঠে বুদ্ধিজীবী সহিস
চিঁড়ে-ভাজা চা সহযোগে পিকাসো-মাতিস
কিংবা ফিফ্‌থ্‌ সিম্ফনি
মৃদু টিপ্‌পনি
বুঝেছো পলিটিক্যাল ফাঁকি
মিরাক্যল না হাতি, গান্ধী নেহাৎই লাকি।
কলকাতা আশ্চর্য সহর
ঠিক প্যারিসের পর।
হায়, জানি না প্যারিস কন্দর
এখানে নেহাৎই দেশী রন্দর।

তিন দিন তিন রাত্রির পর
আর কী চাইবে ?   কিংবা পাবে ?
অল্প-অল্প চিঁড়ে-ভাজা খাবে।
আলমারিতে ফরাসি বই
ইনটেলেকচুয়াল মই

মাঝে-মাঝে চোরা ব্ল্যাণ্ডির ফাঁকে
কয়েকবার বিপ্লবের কথা হাঁকে
কিছুতেই কিছু হয় না
বাঁধা বুলির ময়না
আকাশের আশ্চর্য রোদ চোখে সয় না।

তিন দিন তিন রাত্রির পরের বিকেল শেষ হলো
আবার হাওয়া বইছে জোলো।
মেঘ জমছে
হয়তো বৃষ্টি নামবে
কণ্ট্রোলের ছাতাটা কই ?
আর পুরনো বই—
ওই
ট্রাম চলেছে। সত্যিই মেঘ জমছে
সত্যিই বালি ঝরছে
রাত দশটার ট্রাম বেশ ফাঁকা
একা। ফিরছি একা।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (১৯১৭-)

১৫৩ একচক্ষু

যতোদূর দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে সতৃষ্ণ তাকায়।
পৃথিবীতে প্রকৃতিতে আয়োজন কম
হয়নি তো কোনোদিন, চৈত্রদিনে বসন্তবাতাস
প্রবাহিত হয়েছেই, ঘনঘোর শ্রাবণের রাতে
মেঘে-মেঘে ঝরেছে আকাশ;
স্বর্ণবর্ণ তপনের কিরণসম্পাতে
মসৃণ সবুজ মাঠে হেসেছে তো হেমন্তের সোনালি শিশির;—
গ্রীষ্মের প্রখর দিনে তীব্র আম্রমুকুলের ঘ্রাণে
ডালে-ডালে অজানিত পাখীদের ভীড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
সৌন্দর্যের আবেদন ঋতুতে ঋতুতে প্রতি মানুষের কাছে
আকাশে যে সূর্য ওঠে তার পিছে ঘন নীলিমায়
দিগন্তের মেঘে-রঙে অপূর্ব বিস্ময় দেখা যায়,—
পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে ঘোর রাতে ঘুম ভেঙে দিয়ে
খেলা করে রূপসীর মুখের মতন
অচেতন নিরুত্তাপ হৃদয়কে নিয়ে;
কখনো ফুলের ঘ্রাণ আমাদের প্রাণ ছোঁয় চুম্বনের মতো;
পৃথিবীতে আয়োজন অব্যাহত থাকে অবিরত।
আমরাই একচক্ষু শুধু, ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে
জলে স্থলে শূন্যে নীলে চিরন্তন ছায়া-শরীরিণী
নব-নব রূপে হানা দেয় দগ্ধ হৃদয়ের বিবেকের কাছে,
অনেক নিভৃত রাত্রে শোনা যায় বিচিত্র কিঙ্কিণী।

মাঠে-মাঠে ছায়া পড়ে, ছায়া সরে' যায়,
হঠাৎ হাওয়ার ঢেউ আন্দোলিত গাছের পাতায়;
মনে পড়ে' যায়
দূরের উজ্জ্বল মুখ সুবসনা সুনয়না অরূপ মধুর,
স্তম্ভিত মুহূর্তে মন স্মৃতিভারে স্তব্ধ তন্দ্রাতুর;
বহু ক্রোশ পথ হ'তে এসে
হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ধীরে-ধীরে মেশে
একটি গভীর ক্ষীণ সুর।

নিভৃত হৃদয় নিয়ে যদি কোনো একদিন শুভ অবসরে
আচ্ছন্ন হৃদয়বাষ্প ফুল হ'য়ে ঝরে,
স্নানরতা রমণীর পদ্মওষ্ঠে স্তনযুগে কটিতটে চোখ গিয়ে পড়ে,
দোলা লাগে হাড়ভাঙা বক্ষের পিঞ্জরে,

মনে রেখো নীলাকাশ বাঁকা চাঁদ নীল ফুল মাঠের শিশির,
পাতার আড়ালে পাখীদের
ছায়াঘেরা ছোট-ছোট নীড়।

প্রকৃতিতে আয়োজন বরাবরই ছিল আর এখনো তো আছে,
কুমারীর মতো তার অনেক প্রত্যাশা
আগন্তুক মানুষের কাছে;
প্রখর বিবেক-বাণ প্রাণে অবিরত,
আমরাই একচক্ষু, আমরাই ঘূর্ণাবর্তে গিয়েছি তলিয়ে
ক্ষ'য়ে-যাওয়া দগ্ধ চূর্ণ প্রস্তরের মতো,
বাঁচবো কী নিয়ে ?

তবুও হঠাৎ যদি সংসারের আবর্জনা ঠেলে
নীড়মুখী পাখীর মতন
দুরন্ত আবেগ বুকে জেনুলে
একঘেয়ে প্রয়াসের হয় ব্যতিক্রম,
যদি দূরে দৃষ্টি যায়
কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে রোমাঞ্চিত মনের উদ্যম
সদ্যোজাত নীপবনে ফুলে ফলে সতৃষ্ণ তাকায়
মনে রেখো পৃথিবীর রোমাঞ্চিত প্রকৃতির মৌন প্রতীক্ষায়
কোনো অন্ত কোনো সীমা কোনো শেষ নেই,—
আচ্ছাদন খুলে ফেলে রমণী নেমেছে যেই জলে
কামনার পদ্মগুলি ফোটে পলে-পলে,
মনে রেখো নীতিবাক্য : অপমৃত্যু ডেকে আনে একচক্ষু
যতো হরিণেই ॥

১৫৪ হে ললিতা, ফেরাও নয়ন !

হে ললিতা, ফেরাও নয়ন !
যদি শুভ্র শ্রীদেহের স্বাদ
আর নৈশ আশ্লেষ-শয়ন
মুক্তিস্নান এনেছে জীবনে,
দূরে থাক্ লোক-পরিবাদ।

জীবনের নাট্য-যবনিকা
পড়ে' যাবে মনে রাখো নাকি ?
মুছে গেলে জীবন্ত জীবিকা
কী করিবে তখন একাকী ?
শুধু চোখে ক্লান্ত গতভাষ !

হৃদয়ের ব্যাকুল শ্বাপদ
খুঁজে ফেরে আরক্ত শিকার,
কান পেতে স্থির হ'য়ে শোনে
পক্ষধ্বনি শত বলাকার।
ঘুম নাই নিদ্রালু নয়নে।

উতরোল নিবিড় রজনী।
খোলো রক্ত লাজ-আবরণ,
লজ্জা-অপমান শংকা ছাড়ো !
শোনো মোর ধমনীর ধ্বনি,
আগে রাখো মানুষের মন !

উপরেতে আকাশ ছড়ানো,
নীচে কাঁপে মদালসা বায়ু,
হে ললিতা, কাছে এসো শোনো-
হিমসিক্ত তোমার চুম্বনে
শেষ হবে মোর পরমায়ু !

অদূরেতে কৃষ্ণ মৃত্যু কাঁপে,
তবু যেন তৃণের মতন
ভেসে চলি অন্তিম বিপাকে,
আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ অচেতন,
মৃত্যু আনে নৈশ পরিশ্লেষ !

তাণ্ডবের দীর্ঘশ্বাস শুনে
আছিলাম ঘোর অচেতন,
আকাঙ্ক্ষার জাল বুনে-বুনে
এইবার হয়েছে উধাও
বক্ষোমাঝে উদ্ধত নয়ন !

এই লহো মোর দুই হাত।
অতীতের সাধনায় বুঝি
আকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু-বরাভয়
লভিয়াছি দেহপ্রান্ত খুঁজি !
ক্লান্ত তনু সুন্দর অক্ষয়।

হরপ্রসাদ মিত্র (১৯১৭-)

১৫৫ এসপ্ল্যানেড

সে-ছবি আমার নিভৃত মনের রচিত,
আকাশ সেখানে হাজার তারায় খচিত—
আজো অক্ষত সে নিঃশব্দ ঘাসের আস্তরণ,
স্তব্ধ সেখানে বিশাল প্রাচীন বন।

এখানে শহর লক্ষ কণ্ঠে প্রগল্‌ভ
এ-মাটি মাড়িয়ে, এ-সীমা ছাড়িয়ে,
কী বলবো ?

অনেক স্রোতের ধারণা,
বহুপদাহত ধুলোয়, হাওয়ায়
বহু ইচ্ছার চারণা।
নকল দাঁতের গৌরবে কালমূষিক মুখর সর্বদা,
নকল হাতের ধাক্কায় ঘড়ি এখানে ডোবায় সব কথা।
সুমিত বিভাগ প্রহরে, মিনিটে, দণ্ডে,
অপলে-অনুপলে বহু বিচিত্র খণ্ডে।

এ অবরোধের, অচল বোধের সীমানাকে যাবে ছাড়িয়ে ?
বিকেলের আলোরঞ্জিত এই ইটের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ?
স্বপ্নের কথা ফুরোলে বরং রাত্রে, গভীর রাত্রে
হৃদস্বপ্নের শ্রান্তি ঘুচিয়ো নতুন মদের পাত্রে।
লাগবে বাতাস তৃষিত শরীরে, মনে
জনজর্জরভারবিমুক্ত এসপ্ল্যানেডের কোণে।
বহু ধিক্কৃত-লাঞ্ছিত কৈশোর
হয়তো ফিরবে স্মৃতিমধুগুঞ্জনে।

এখানে মানুষ যন্ত্রমন্ত্রে বিধৃত।
ইস্পাতে গতি ঝংকৃত।
অন্য চিন্তা নিন্দিত।

যেখানে মনের অন্তিমচ্ছেদ, সেখানেও মাটি শব্দহীন—
বিচ্ছেদহীন সেখানে অশেষ রাত্রি-দিন।
নদী-গিরি-বন-আকাশ শূন্যে বিধৃত।
সব গতি সেই আদি উৎসেই নিঃসৃত।

হাঁসের পালক পান্নাসবুজ ঘাসে,
নীল চাঁদোয়ায় ঢাকা সুবর্ণরেখা,
পান্থশালায় দীর্ঘ রাত,
দীর্ঘ, স্তব্ধ রাত।
যদি মন হয় ক্লান্ত, সেখানে চলো
করুণ, পরম, নির্মম কথা বলো।

মুছে দিক দিন চোখের তিমির হ্রদ—
ঠোঁটের, বুকের, গালের প্রসন্নতা;
বলো প্রসিদ্ধ প্রেমের পুরাণ-কথা।
সপ্তাহান্তে ছুটির ছবির দ্বীপে
না-হয় ক্ষণেক ভুলো এ-পৃথিবীটিকে।

ফিরে এসো ফের নতুন তৃষ্ণা নিয়ে
নতুন হতাশা নিয়ে,
ফিরে এসো এই বহু-চাকা-ঘর্ঘরিত ইটের দেশে—
শঙ্করী মনের সব সাঁতারের শেষে।

এখানে শহর লক্ষ কণ্ঠে প্রগল্‌ভ।
এখানে দাঁড়িয়ে এ-মাটি মাড়িয়ে কী বলবো ?
স্বপ্নের কথা ফুরোলে বরং রাত্রে—গভীর রাত্রে
হৃদ্‌স্বপ্নের শ্রান্তি ঘুচিয়ো নতুন মদের পাত্রে।
লাগবে বাতাস তৃষিত শরীরে মনে।
গভীর অন্বেষণে—
হয়তো বা দেবে চূড়ান্ত নির্বেদ
বহুমন্থনমুক্ত এসপ্ল্যানেড।

মণীন্দ্র রায় (১৯১৯-)

৫৬ অতিক্রান্তি

যখন কেবলি মানসকামনা
সরাতো বুকের লঘু পাহাড়,
ষড়জে-নিখাদে এঁকেছি কতো-না
আত্মরতির সুরবিহার।

রাগমালা সেই মনের আকাশে
বর্ষণভীরু বলাকামেঘ,
হালকা সাঁতারে আসে যায় আসে
প্রথম প্রেমের মতো আবেগ।

নবফাল্‌গুনে কখনো বা তার
সাড়ায় কেঁপেছে নতুন পাতা,
ভুঁইচাঁপা খোলে চকিত দুয়ার,
দীঘি ভরে ঢেউয়ে নীলের খাতা।

শুধু ঐটুকু, তার বেশী নয়
একসুরে সাধা সেই রাগিণী
কখনো গোপনে খুঁজেছে প্রণয়,
কখনো বা সাজে বৈরাগিণী।

সে আকাশে আজ বজ্রের দাহ
এল বিদ্যুৎজ্বালা বৈশাখ,
সে মেঘে তরল অগ্নিপ্রবাহ,
সে গানে রুদ্র মত্তপিণাক।

হৃদয়ের বাঁধ ভেঙে খান্ খান্,
মনের মিনারে ন'ড়ে ওঠে ভিত,
সুরের ঘূর্ণিপ্রলয়ের বান
আনে পাতালের একি সঙ্গীত!

ভাষার পরিধি ছিঁড়ে উড়ে যায়,
খনিজ বিস্ফোরণের আখরে
জ্ব'লে ওঠে মন ধাতব আভায়,
রক্তে গতির বর্ণালী ঝরে।

এ গান আমার অভিজ্ঞতার
জীবাণে অনুস্বপ্নকণায়
ফস্‌ফরাস্‌-এর শত দীপাধার
জ্বালে সমুদ্র ঢেউয়ের ফণায়।

ফেটে প'ড়ে আজ এই সুর বুঝি!
কাঁপে মনে সূর্যাগ্নির স্তব।
এল কি মুক্তি! রঙে রঙে মুছি
রাত্রি, ঊষার একি বিপ্লব!

১৫৭ স্বদেশ

ম্রিয়মাণ হৃতশক্তি হে স্বদেশ,
প্রণাম। শতাব্দীশেষ
মূঢ় তমিস্রার; সূর্যোদয় আরক্ত গম্ভীর
বিহ্বল দিগন্তপারে, স্থাণু জনতার

স্নায়ুজালে—ধমনীর লোহিত বিস্ময়ে।
জাগে স্তম্ভিত মাটির
দলিত নিরুদ্ধ স্বাধিকার।
স্থবির শতাব্দীশেষে হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

দম্ভের প্রাসাদচূড়া হ'তে
নিষ্পিষ্টের বঞ্চিতের পুঞ্জীভূত বেদনার স্রোতে
যাহারা দেখেছে শ্লেষে মেখলার প্রায়,
পিশাচ বাতাসে ঘোরে সে-কলঙ্ক করুণ অধ্যায়।

স্বর্ণ রশ্মি দিবসের উচ্চকিত গতি
মর্মরিত জনারণ্যে আনে আজ সবুজ উল্লাস।
যুগান্ত-তোরণ পথে জয়যাত্রা। শ্লথ পাশ
জীবনের, জড়তার।
হে স্বদেশ, প্রণাম আমার।

বাণী রায় (১৯১৯-)

১৫৮ বৎসরের গান

১

পুরাতন বৎসরের ক্লান্ত পদধ্বনি
শুনি নাই, শুনি নাই আমি।
শুষ্ক পত্র-মর্মরসভায়
চলে যায়, চলে যায়—
রৌদ্রদগ্ধ বৎসরের জীর্ণ শ্রান্তকায়।
বাতায়নে রেখে কান, শুনেছ কি গান ?
নীল পাখী, আশা-পাখী, পাখা-ঝাপটায়;
নূতন দিনকে ডাকে গানের সীমায়।
রৌদ্রের রক্তিম বর্ণে আপেল ফলায়।
কত ফুল ফুটে যায়! মোশুমী ফুল।
সবুজ মনেকে ঘেরে ডেইজি-গোলাপ।
বিদেশীর উচ্চ কণ্ঠে বর্ষ-আবাহন

সহসা ডাকিয়া নেয় এই দেশী মন।
কত ডেইজি ঝরে গেছে পরাগ ঝরায়ে;
সোনালী বক্ষের আভা মিশেছে মাটিতে
ক্ষণস্থায়ী ডেইজি শুধু ফুটিছে ঝরিতে;
বিশীর্ণ পরাগ-শয্যা বিস্মৃতির ছায়ে!
চ'লে এস বাতায়নে, ঝরে যাক ফুল;
চেওনা ফুলের দিকে;—দেখ চোখ তুলে,
আশা-পাখী, নীল পাখী, করে কলগান।
গানে গানে জেগে ওঠে বৎসরের প্রাণ।

২

সে পাখীর চক্ষে কভু ঝরে অশ্রুবারি,
যে পাখী গেয়েছে গান এই বাতায়নে?
(অসামান্য আজও তুমি আমার অন্তরে,
বাহিরে ভুবন জানে তুমি সাধারণ;
ভাবরাজ্যে পরদেশী, তুমি নাগরিক।
কী কাজ মস্তিষ্কে, যার রূপের ভূষণ?)
পাখীর চোখেও তবু দেখা দেয় জল
ক্রিসমাস-কার্ড-রঙ পড়েনি তো ধরা,
আমার পাখীর চোখে জলের ইসারা,
আমার আশার পাখী এক ডানা ভাঙা।
প্রেমের বিদায়ে গাঁথা বর্ষশেষ গান,
নিবন্ত আলোর মতো কম্পিত ব্যথায়।
তবু ডানাভাঙা পাখী পাখা ঝাপটায়;
তবু তারি গানে গানে শিহরিত প্রাণ।

৩

ক্রোকাসের ঝোপে-ঝোপে বিদেশী বন্দনা
শোন বন্ধু, কান পেতে;
আসিছে জীবন,
নূতন জীবন নিয়ে নব বর্ষাগম।
আমেন! আমেন!

সুমহান বাজে দূরে গির্জার শিখরে।
খৃষ্টীয় প্রণয়ে কর বৎসরে প্রবেশ।
জাপানী ফানুষ প্রেম ছিঁড়েছে আমার,
নিভেছে মোমের বাতি।
ছোট ছোট মোম,
লাল-নীল-পীত-সাদা,
জেবলেছিনু আমি
তোমারি বেদীর তলে, দেবতা আমার।
যে-দেউলে আলো কবে চন্দ্র-সূর্য-ভাতি;
বিশাল যজ্ঞের শিখা দীপ্ত বহ্নিমান
যে-দেউলে নভোগামী,
সেই দেবালয়ে
ছোট-ছোট, নানা রঙা মোমবাতি সাজে
উজ্জ্বল করিতে আমি চেয়েছি, ঈশ্বর!
যে-প্রেম অনন্তকাল নিজের শোনিতে
পতিতেব মুক্তিকামী,
সেই প্রেমশিখা
জাপানী ফানুষে আমি
চেয়েছি ধরিতে
ক্ষুদ্র বর্তিকার মাঝে।
হে প্রেমের দেব,
আজ বৎসরের শেষে,—খৃষ্টীয় বৎসর—
সারা চিত্ত ব্যগ্র হ'য়ে, চায় অবতার
প্রেমের প্রতীক চায়
মুক্ত চিত্ত ধায়
ভুলে জাতি-বর্ণ-দেশ ধরিতে তোমায়!

৪

পাখীকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন স্থান,
আমাকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন প্রাণ।
কত বার ম'রে ম'রে আসিলাম ফিরে;
শঙ্কিত কম্পিত পায়ে তমসার তীরে।

মরেছি হাজারবার প্রেমের মরণে,
নূপুর বেজেছি কত চরণে চরণে !)
পরিশ্রান্ত আজো যারা,
ধরণী-সীমায়
বিষাদের ঘন মেঘে জীবনের দায়
টেনে চলে অশ্রুচোখে;
নিদ্রার লাগিয়া
পাখীর ডানার সুপ্তি নিয়ত মাগিয়া
আকাশে পাঠায় তারা কণ্ঠ প্রার্থনায়;
তাদের পুরানো বর্ষ দিতেছে বিদায়
ডেইজির ঝরানো দলে।
যে-নারীর বুক
আজো ভরে নাই কোনো আকাঙ্ক্ষার সুখ;
যার চোখে নামে নাই মধুর স্বপন
প্রণয়সম্ভোগ শেষে;
যে-নারীর দেশ
দুইটি আঁখির জ্যোতি করে নাই আলো;
তাহাকে বিদায় দাও, হে বর্ষ প্রাচীন।
আনো নব দিন,
নবীনা ধরার বক্ষে নূতন বরষ,
নব মানুষের জন্য।
প্রেম-অবতার
তোমার শোণিতে জন্ম লভিবে আবার।

৫

(আমার প্রেমের গীতি আজও চিরঞ্জীব,
তারায় তারায় গাঁথা বিরহ-বিলাপ
পৃথিবীতে ফিরে আসে, ডুবে যায় সুর।
বৎসরের শোভাযাত্রা, বিরহে আমার।
পরায়ে দিয়েছি বধূ, যেই কণ্ঠহার,
আরক্ত গোলাপ-গাঁথা বাসনা রঙীন,
সে-ফুল ঝরেছে আজ ম্লান ধূলিলীন,

কেকের কামড়ে ফেরে স্মৃতি-পিপীলিকা।
বৈদেশিক ভাবে মুগ্ধ বিদেশীর প্রেমে,
বৎসরে বন্দনা করি অন্তর-বাহির,
একজনে ভালোবেসে করেছি জাহির;
সে-প্রেম মিলালো আজ—হায় মরীচিকা
আমার আত্মার পাখী এক ডানা ভাঙা।
কেন তুমি ফিরে এলে, হে বর্ষ আবার ?
নিয়ে এলে নীলাকাশ, স্মৃতিরাগে রাঙা;
নিয়ে এলে সেই ফুল, প্রেমে জন্ম যার !

৬

শীতের হিমানীযুক্ত পাহাড়ে পাহাড়ে
বাজে আজ মেঘমন্দ্র—শোনো কী যে বলে
'নূতন দেবতা এসো নবছন্দোসুরে
প্রাচীন, বিদায় নাও, নবখ্রীষ্ট এসো।'
তোমার দেবতা আজ আমারও দেবতা,
হে বিদেশী;
প্রাণ মন খুলেছে মৈত্রীতে,
সমগ্র জগৎ আমি চাই বক্ষে নিতে,
আমার প্রেমের শিখা আজ সর্বগামী।
ফুল যদি ঝ'রে যায়,
বিদায়-সভায় যদি এই গীতি গায়
প্রেমের বিদায়,
যায় যাক তুচ্ছ প্রেম, জানি নব প্রেম,
আমারে চাহিয়া আছে দিগন্ত সীমায়।
বৎসরের জীর্ণ ভস্মে জাগো, জাগো আশা,
ভালোবাসা তুচ্ছ—গাও জীবনের ভাষা ॥

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৯২০-)

১৫৯ প্রস্তাব

প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই।
কোনো দ্বিরুক্তি করবো না। নেবো তীর ধনুক।

এমনি বেকার। মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই—
দেহ না চ'লুলে, চ'লুবে তোমার কড়া চাবুক।

হা-ঘরে আমরা! মুক্ত আকাশ ঘর, বাহির।
হে প্রভু, তুমিই শেখালে, পৃথিবী মায়া কেবল—
তাইতো আজকে মন্ত্র নিয়েছি উপবাসীর।
ফলে নেই লোভ! তোমার গোলায় তুলি ফসল।

হে সওদাগর,—সিপাই, সান্ত্রী সব তোমার।
দয়া ক'রে শুধু মহামানবের বুলি ছড়াও—
তারপরে, প্রভু, বিধির করুণা আছে অপার।
জনগণমতে বিধিনিষেধের বেড়ি পরাও।

অস্ত্র মেলেনি এতদিন। তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিলো তীর ধনুকের, ছেলেবেলায়!
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলুবো, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাবো কান॥

১৬০ বধূ

গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো
পুরানো সুর ফেরিওলার ডাকে,
দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া
গ্যাসের আলো-জ্বালা এ দিনশেষে।
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু চালে
হঠাৎ গ্রাম হৃদয়ে দিলো হানা
পড়লো মনে, খাসা জীবন সেথা।

সারা দুপুর দিঘির কালো জলে
গভীর বন দুধারে ফেলে ছায়া

ছিপে সে-ছায়া মাথায় করো যদি
পেতেও পারো কাৎলা মাছ, প্রিয়।
কিম্বা দোঁহে উদার বাঁধা ঘাটে
অঙ্গে দেবো গেরুয়া বাস টেনে
দেখবে কেউ নখ, বা কেউ জটা
কানাকড়িও কুড়েয় যাবে ফেলে।

পাষাণ-কায়া, হায়রে, রাজধানী
মাশুল বিনা স্বদেশে দাও ছেড়ে;
তেজারতির মতন কিছু পুঁজি
সঙ্গে দাও, পাবে দ্বিগুণ ফিরে।
ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারি,
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।

ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও; লোক লোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
—লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।
বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা; তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা
কলসি কাঁখে চলেছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।

১৬১ নির্বাচনিক

ফাল্গুন অথবা চৈত্রে বাতাসেরা দিক্ বদলাবে।
কথপোকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি,—
“অবশ্যকর্তব্য নীড়।” (মড়া কাটা ঘর,—স্থানাভাবে ?)

নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; টাঁকে টুকরো অর্দ্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হতো হাবে ভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙ্গুলে স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ।—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ !

‘জীবন বিস্বাদ লাগে !’—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।

১৬২ কিম্বদন্তী

চলছিলো এতকাল বেসাতি
নিরাপদে বেশ এ-দাস দেশে।
আজকে ঢেউয়ের অলিগলিতে
যমদূতে দেয় ডুব সাঁতার।
আদার ব্যাপারী, তাই বুঝি না,
জাহাজের হালচাল কিছুই।
কেবল গ্রাম্য হাটবাজারে
ভেসে আসে কানে ক্ষীণ গুজব ॥

১৬৩ একটি কবিতার জন্য

একটি কবিতা লেখা হবে, তার জন্য
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে
অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে
পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে
বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়
সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে
রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে
ভস্মলোচন।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এ'টে দেয় কারা
অনাগত একদিনের ফতোয়া
মৃত্যু ভয়কে ফাঁসীতে লটকে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালোবাসা।
একটি কবিতা লেখা হয় তার জন্যে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯২০-)

১৬৪ মুখোস

কান্নাকে শরীরে নিয়ে যারা রাত জাগে,
রাত্রির লেপের নিচে কান্নার শরীর নিয়ে করে যারা খেলা,
পৃথিবীর সেই সব যুবক যুবতী
রোজ ভোরবেলা
ঘরে কিংবা রেস্তোরাঁয় চা দিয়ে বিস্কুট খেতে-খেতে
হঠাৎ আকাশে ছোঁড়ে দু'চারটি কল্পনার ঢেলা :

এবং হাজারে কয় রান ক'রে আউট হ'য়ে গেছে
ভুলে গিয়ে তারা হয় হঠাৎ অদ্ভুত।
যুবতীকে মনে হয়, হয়তো বা সেরে গেছে সকল অসুখ,
যুবককে মনে হয়, কোনো-এক রহস্যের দূত
কার যেন স্মৃতিমুখ পাঠায়েছে আমাদের মতো কোনো
প্রণয়ীর কাছে ;
সুন্দর কি কুৎসিত জানি না, তবু জানি মার্চেন্টের মারে
নেই এই সব খুঁত।

কান্নাকে সরিয়ে রেখে দৈনিক কাগজ খুঁজি তাই,
যুবককে ভুলে যাই, যুবতীকে দূরে-দূরে রাখি;
তারপর কোনোদিন যদি মনে হয়
দিনগুলি বাসি বড়ো বিবর্ণ একাকী
প্রেমিক কি উদ্বাস্তুর মতো এক সমস্যায় নিতান্তই মূর্খ হ'য়ে
গেছে :
আমার কী আসে যায়, তুড়ি মেরে এগজামিনে দিয়ে যাবো
ফাঁকি !

অথবা কবিতা দিয়ে সমর্থন জানাবো তোমাকে,
হে প্রেমিক, হে উদ্বাস্তু, তোমাদের দুঃখে আমি গ'লে
হবো নদী !

হে দিন, হে কালরাত্রি,
না-হয় আগলাবো আমি তোমাদের দুর্দিনের গদি।
তোমরা নির্বোধ হাতে স্মৃতিমুখ খুঁজে-খুঁজে প'ড়ে যাবে
যখন অসুখে,
তোমাদের দুঃখে আমি ম'রে যেতে রাজি আছি—কারো
দুঃখে মরা যায় যদি।

কী আশ্চর্য ! সেই ছেলে আমার দর্শন শুনে তবু
অর্ধেক বিস্কুট ফেলে রেস্টোর‍্যাণ্ট থেকে
চ'লে গেল। সেই মেয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপনে ভিড়ে
ডুবে গেল, তারপর কী যেন বললো সঙ্গিনীকে।
মনে হ'লো হেমিংওয়ে মমু নিয়ে ওদের বিবাদ
আজন্ম চলেছে যেন, বন্ধুত্বটা কোনোমতে আছে তবু টিকে !

হঠাৎ পড়লো চোখে কাগজের এডিটরিয়াল,
আমেরিকা ভালো, চীন ভালো...
ট্রুম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল :
হৃদয় জুড়ালো।

হে যুবক, হে যুবতী, পৃথিবীতে তোমাদের কতটুকু দাম ?
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা দিয়ে গেলে আলো

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (১৯২১-)

১৬৫ আমার ভালবাসা

আমার দিনমান আপনমনে শুধু মনের পথ হাঁটা
আমার সারা রাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোনা
এমনই লোকে লোকারণ্য সংসার, আমি ছিলাম একা
ঘরের কোণে ছিল একটি মুখ সে-ই আমার ভালবাসা।

মনের অন্দরে বন্দী পাখি ও যে থাবত চোখে চোখে
নিজেকে ঠুকরিয়ে নিজেকে নিয়ে বড় ব্যস্ত—মুখে মুখে
গোপন জানাজানি আমাতে-ওতে শুধু, শুধু, আমাতে-ওতে
ঘোমটাটানা মুখ ঘরের কোণে সে ই আমার ভালবাসা।

সূর্য বারবার দিতেছে হানা ঃ দিন দগ্ধ পথরেখা
হৃদয় ফেরি করে ফিরেছে দোরে রাত উতল তারাহারা
আকাশ ফিরে গেছে বাতাস হাহাকার হেঁকেছে এস এস
ঘরের কোণে মুখ লুকিয়ে তবু সে-ই আমার ভালবাসা।

আজ কি হাহাকার হাজার হাতে তার ভেঙেছে খিল—আসে
প্রবল কলরব বন্যা বাঁধভাঙা বাহির ঘরে আসে
হাসির হল্‌কায় দম্‌কা অভিমানে হাওয়ায় দিশাহারা
ঘোমটা খসে গেছে তুলেছে মুখ সে-ই আমার ভালবাসা।

আমরি ! আজ বুঝি সারাটা সংসার মুখেরই সমারোহ
যেদিকে চাই মুখ স্নিগ্ধ ধারাস্নান মুগ্ধ দক্ষিণা
যেদিকে যাই মুখ শান্ত নীলাকাশ মাটির শ্যামলিমা
ঘোমটাখসা মুখ তুলেছে তার সে-ই আমার ভালবাসা।

আ মরি! সেই মুখ কখন চাপা ঠোঁটে চণ্ড বৈশাখী
দীপ্ত বিদ্যুৎচমক দুই চোখে—ঝড়ের নাগিনী সে
ফুঁসছে এলোচুলে ক্রুদ্ধ কালো মেঘ হৃদয়ে দুন্দুভি
সারাটা সংসার, একটি মুখ সে-ই আমার ভালবাসা

১৬৬ মনে পড়ে

একটি মেয়ের চোখ আজকে বারবার মনে পড়ে।
প্রথম প্রাণের কথা হঠাৎ উস্‌খুস্‌ সেই চোখে,
টিয়াপাখি-রঙ্‌ শাড়ি নেশায় রিমঝিম ঃ বলে লোকে।
এমনি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।

ভোমরা গাঁয়ের পথে স্পষ্ট দেখলুম, মনে পড়ে,
ঝুমকো লতার মত ঈষৎ চমকায় সেই মেয়ে,—
একটি ধানের শিষে হাসির ঝিক্‌মিক্‌ দোল খেয়ে
উংরে এলুম কত মাঠের পথ তার রেশ ধ'রে।

আজকে দিনের শেষপ্রান্তে পৌছই এ-শহরে।
মরছে পাথর-চাপা তেমনি এক মেয়ে বোবা-চোখে
এদেশে—এদেশ নাকি প্রাণের কংকাল ঃ বলে লোকে।
এখানে শূন্য মন, চোখেরও ডাক নেই ঘরে ঘরে।

একটি মেয়ের চোখ হঠাৎ বারবার মনে পড়ে।

অরুণকুমার সরকার (১৯২২-)

১৬৭ জন্মদিনে

সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি,
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও-দু'টি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

দুরাশা আমার সীমাহীন বটে
তবুও কি জানি দৈবে কী ঘটে।
দ্বিধাবিজড়িত লজ্জাপীড়িত
এ-হৃদয় ঝাউবৃক্ষের পাতা,—
যার জানালায় দু'বাহু বাড়ায়
নেই সেই জন ঘরে অবশ্য।

এই তো সেদিন সারা প্রান্তরে
সময়ের সোনা দূরবিস্তৃত।...
হায় রে, কখন কেটেছে সকাল,
দুপুর ছুঁয়েছে বিকেলের লাল;
তারার আলোতে ভেসে গেছে স্রোতে
গানের প্রাণের হিজিবিজি খাতা।
আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে
ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।

মাথা পেতে তবে মেনে নিতে হবে
শাদা আরশির নিরেট ব্যঙ্গ?
যে-কুসুমগুলি মেখেছিল ধূলি
তা-ও কি পাবে না তোমার সঙ্গ?

স্মৃতি থেকে তাই এনেছি দু'মুঠো
গন্ধমদির আমন ধান্য।
ও-দু'টি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাব কি পরশ যৎসামান্য?

১৬৮ জর্নাল থেকে

বৃষ্টিভেজা বাড়ির মতো রহস্যময়
তোমার হাতে আছে আমার একটু সময়।

কত দিনের কত রাতের ঝাপসা তুলির
রঙে রেখায় আঁকা আমার একটু সময়।

নরেশ গুহ (১৯২৪-)

১৬৯ শান্তিনিকেতনে ছুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে বসে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয় তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে অংগুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায় ? যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
—দেরি হোক, যায়নি সময় ?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙাভাঙা গলা
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে ? ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেল। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?

১৭০ রুমির ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাস।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল
ভ'রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

১৭১ মাঘ শেষ হয়ে আসে

মাঘ শেষ হয়ে আসে,
ভোর হ'ল হিমে নীল রাত।
আলোর আকাশগঙ্গা ঢালে কত উল্কার প্রপাত।
আনত ওষ্ঠের তাপ বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।
তবু ক্লান্তি চোখের চাওয়ায়।
দিন ভ'রে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,
তুমি কাছে নাই।
বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪-)

১৭২ ভয়

যদি এ চোখের জ্যোতি নিভে যায় তবে
কী হবে, কী হবে!

দূরপথে ঘুরে ঘুরে ঢের নদীবন
খুঁজে যাকে এই রাতে নিয়ে এলে মন
এখনো দেখিনি তাকে দেখিনি, এখন
যদি এ চোখের জ্যোতি নিভে যায় তবে
কী হবে, কী হবে !

সে-ও চলে যেতে পারে, যদি যায় তবে
কী হবে, কী হবে !
এই যে চোখের আলো, ব্যথাবেদনার
আগুনে রেখেছি তাকে জ্বেলে আমি, তার
দেখা পাওয়া যাবে, তাই। সে যদি আবার
চলে যায়, চোখ ভরা আলো নিয়ে তবে
কী হবে, কী হবে !

কখনো হারাই প্রাণ, কখনো প্রাণের
থেকেও যে প্রিয়তর, তাকে। সারাদিন
কথা মনে ছিল কোনো মায়াবী গানের,
সুর খুঁজে পেলে তার নিবিড় নবীন
কথাগুলি যদি ফের ভুলে যাই তবে
কী হবে, কী হবে !

সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭)

১৭৩ একটি মোরগের কাহিনী

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু' তিনটি মুরগীর সঙ্গে।

আশ্রয় যদিও মিললো,
উপযুক্ত আহার মিললো না।
সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে

গলা ফাটালো সেই মোরগ,
ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত—
তবুও সহানুভূতি জানালো না সেই বড় শক্ত ইমারত।
তারপর শুরু হ'লো তার আঁস্তাকুড় আনাগোনা।

আশ্চর্য ! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগলো
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর এক সময় আঁস্তাকুড়েও এলো অংশীদার
ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়া পরা দু' তিনটে মানুষ;
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হ'য়ে।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করলো প্রাসাদে ঢুকতে,
প্রত্যেকবারেই তাড়া খেলো প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু ক'রে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভেতর রাশি রাশি খাবারের।

তারপর সত্যিই সে একদিন প্রাসাদে ঢুকতে পেলো,
একেবারে সোজা চ'লে এলো
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসেবে।

১৭৪ হে মহাজীবন

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝংকার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ঃ
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

১৭৫ কবিতার খসড়া

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়, জানেনা কেউ।
উদ্যমহীন মূঢ় কারায়
পুরোনো বুলির মাছি তাড়ায়
যারা, তারা নিয়ে ফেরে পাড়ায়, স্মৃতির কেউ।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২)

১৭৬ পান্থ

(অংশ)

[দার্শনিক সন্ন্যাসী *Schopenhauer* এর উদ্দেশে]

১২

যে স্বপ্ন হরণ তুমি করিবারে চাও, স্বপ্নহর !
তারি মায়া-মুগ্ধ আমি, দেহে মোর আকণ্ঠ পিপাসা !
মৃত্যুর মোহন-মন্ত্রে জীবনের প্রতিটি প্রহর
জপিছে আমার কানে সকরুণ মিনতির ভাষা !
নিষ্ফল কামনা মোরে করিয়াছে কল্প-নিশাচর !
চক্ষু বুজি' অদৃষ্টের সাথে আমি খেলিতেছি পাশা—
হেরে যাই বার বার, প্রাণে মোর জাগে তবু দুরন্ত দুরাশা !

১৩

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী !
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা—
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী !
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা !

নিপুণা নটিনী নাচে, অঙ্গে-অঙ্গে অপূর্ব লাবণি !
স্বর্ণপাত্রে সুধারস, না সে বিষ ?—কে করে শোচনা !
পান করি সুনির্ভয়ে, মুচকিয়া হাসে যবে ললিত-লোচনা !

১৪

জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে,
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি জ্বালি' কামানল !—
এ দেহ ইন্ধন তায়—সেই সুখ !—নেত্রে মোর নাচে
উলঙ্গিনী ছিন্নমস্তা !—পাত্রে ঢালি লোহিত গরল !
মৃত্যু ভৃত্যরূপে আসি' ভয়ে ভয়ে পরসাদ যাচে !
মুহূর্তের মধু লুটি—ছিন্ন করি' হৃদ্-পদ্ম-দল !
যামিনীর ডাকিনীরা তাই হেরি' এক সাথে হাসে খল-খল !

১৫

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম-দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,'
অনন্ত রহস্যময়ী স্বপ্ন-সখী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী !
নেত্র তার মৃত্যু-নীল !—অধরের হাসির বিথারে
বিস্মরণী রশ্মিরাগ ! কটিতলে জন্ম-রাজধানী !
উরসের অগ্নিগিরি সৃষ্টির উত্তাপ-উৎস !—জানি তাহা জানি।

১৬

এ ভব-ভবনে আমি অতিথি যে তাহারি উৎসবে !—
জন্ম-মৃত্যু—দুই দ্বারে দাঁড়াইয়া সে করে বন্দনা !
অশ্রুজলে স্নানোদক ঢালি' দেয়' স্নেহের সৌরভে,
মুক্ত করি' কেশপাশ, পাদপীঠ করে সে মার্জ্জনা !
নিঙাড়িয়া মর্ম্ম-মধু ওষ্ঠে ধরে অতুল গৌরবে !
পরশে চন্দন-রস ! মালাখানি দু'ভুজে রচনা !
আমারে তুষিবে বলি' প্রিয়া মোর ধূলি 'পরে দেয় আলিপনা !

১৭

তবু সে মোহিনী ! আহা, তাই বটে !—হে জ্ঞানী বৈরাগী,
এ জ্ঞান কোথায় পেলে ?—মর্ম্মে-মর্ম্মে তুমি মহাকবি !
রুদ্ধপ্রাণে কুপিতা সে প্রকৃতির অভিশাপভাগী—

কল্পনার নিশিযোগে আঁধারিলে মনের অটবী !
অভ্রভেদী চিত্ত-চূড়া মৃত্তিকার পরশ তেয়াগি'
উঠিয়াছে মেঘলোকে !—সেথা নাই নিশান্তের রবি !—
বিদ্যুৎ-গর্জন-গানে নিত্য সেথা নৃত্য করে ভাবনা-ভৈরবী !

১৮

কহ মোরে, জাতিস্মর ! কবে তুমি করেছিলে পান
ধরণীর মৃৎপাত্রে রমণীর হৃদয়ের রস ?
পূর্বজন্ম-বিভীষিকা ?—তারি ভার প্রেতের সমান
বক্ষে চাপি' স্মৃতি-বিষে করিল কি বাসনা বিবশ ?
ব্যথার চাতুরী শুধু ?—মাধুরীতে ভরে নাই প্রাণ ?
মধু-রাতে মাধবীটি তুলে নিতে হ'ল না সাহস !
ওষ্ঠে হাসি, নেত্রে জল—বুঝিলে না অপরূপ জ্বালার হরষ !

১৯

জীবনের দুঃখ-সুখ বার-বার ভুঞ্জিতে বাসনা—
অমৃত করে না লুব্ধ, মরণেরে বাসি আমি ভালো !
যাতনার হাহারবে গাই গান,—তৃষার্ত রসনা
বলে, 'বন্ধু ! উগ্র ওই সোমরস ঢালো, আরো ঢালো !'
তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা—
এই চোখে আর বার না নিবিতে গোধূলির আলো,
আমারি নূতন দেহে, ওগো সখি, জীবনের দীপখানি জ্বালো !

২০

আর যদি নাই ফিরি—এ দুয়ারে না দিই চরণ ?
অশ্রু আর হাসি মোর রেখে যাবো তোমার ভবনে,
এই শোক এই সুখ নব-দেহে করিয়া বরণ,
মন সে অমর হবে বেদনার নূতন বপনে !
পয়োধর-সুধা দানে ক্ষুধা তার করি' নিবারণ,
জীয়াইয়া তুলি' তারে পিপাসার জীবন্ত যৌবনে,
আবার জ্বালায়ে দিও বিষম বাসনা-বহ্নি বৈশাখী-চুম্বনে !

২১

অন্তহীন পন্থচারী, দেহরথে করি আনাগোনা !—

জীবন-জাহ্নবী বহে নিরবধি শ্মশানের কূলে,
নিত্যকাল কুলু-কুলু কলধ্বনি যায় তার শোনা,
কভু রৌদ্র, কভু জ্যোৎস্না, কভু ঢাকা তিমির-দুকূলে !
জ্বলে দীপ, দোলে ছায়া, ঊর্মিগুলি নাহি যায় গোণা,
ভেসে যাই তটতলে—এই দেখি, এই যাই ভুলে !
স্তব্ধরাতে তারকার পানে চেয়ে আঁখি মোর ঘুমে আসে ঢুলে !

২২

কোথা হ'তে আসি, কিবা কোথা যাই—কি কাজ স্মরণে ?
চলিয়াছি—এই সুখ !—সঙ্গে চলে ওই গ্রহতারা !
ভয়, পাছে থেমে যাই গতিহীন অবশ চরণে,
দিক্‌চক্র-অন্তরালে হয়ে যাই উদয়াস্ত-হারা !—
আমারে হারাই যদি !—যদি মরি সুচির-মরণে !
ব্যথা আর নাহি পাই—শেষ হয় নয়নের ধারা !—
বল, বল, হে সন্ন্যাসী ! এ চেতনা চিরতরে হবে না ত' হারা ?

২৩

এ পিপাসা সুমধুর—বল তুমি, বল, স্বপ্নহর !—
ঘুচিবে না ?—মরণের শেষ নাই, বল আর বার !
তুমি ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা !—বলিয়াছ, এ দেহ অমর !—
সৃষ্টিমূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার !
যূপবদ্ধ পশু আমি ?—ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে ?—না, না, সে যে মধু'র উৎসার !
দুই হাতে শূন্য করি পূর্ণ সেই মধুচক্র প্রতি পূর্ণিমার !

২৪

তোমারে বেসেছি ভালো—কেন জানি, হে বীর মনীষী
ব্যথায় বিমুখ তুমি, তবু তারে করেছ উদার !
করুণার সন্ধ্যাতারা !—মন্ত্রে তব সুশীতল নিশি
তাপশেষে মিটাইয়া দেয় বাদ গরল-সুধার !
স্বপ্ন আরো গাঢ় হয়, সত্য সাথে মিথ্যা যায় মিশি,'
মনে হয়, সীমাহীন পরিধি যে ক্ষুদ্র এ ক্ষুধার !—
পরম-আশ্বাসে প্রাণ পূর্ণ হয়, ধন্য মানি এ মর্ম-বিদার !

২৫

কবির প্রলাপ শুনি' হাসিতেছ ?—তাপস কঠোর !—
স্বপ্নহর ! স্বপ্ন কিগো টুটিয়াছে ? ধূলির ধরার
কামনা হয়েছে ধূলি ? আর কভু নয়নের লোর
বহিবে না !—এড়ায়েছ চিরতরে জন্ম ও জরায় ?
ওগো আত্ম-অভিমানী ! এত বড় বেদনার ডোর
বুনিয়াছে যেই জন, মুক্তি তার হবে কি ত্বরায় ?
দুঃখের পূজারী যেই, প্রাণের মমতা তার সহসা ফুরায় ?

২৬

নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি-চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি' !
উমা সে গিয়াছে ফিরে, অশ্রু-চোখ ম্লান ছল-ছল—
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন-উপরি ;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ—পক্ক বিম্বফল !
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি !

—:o:—